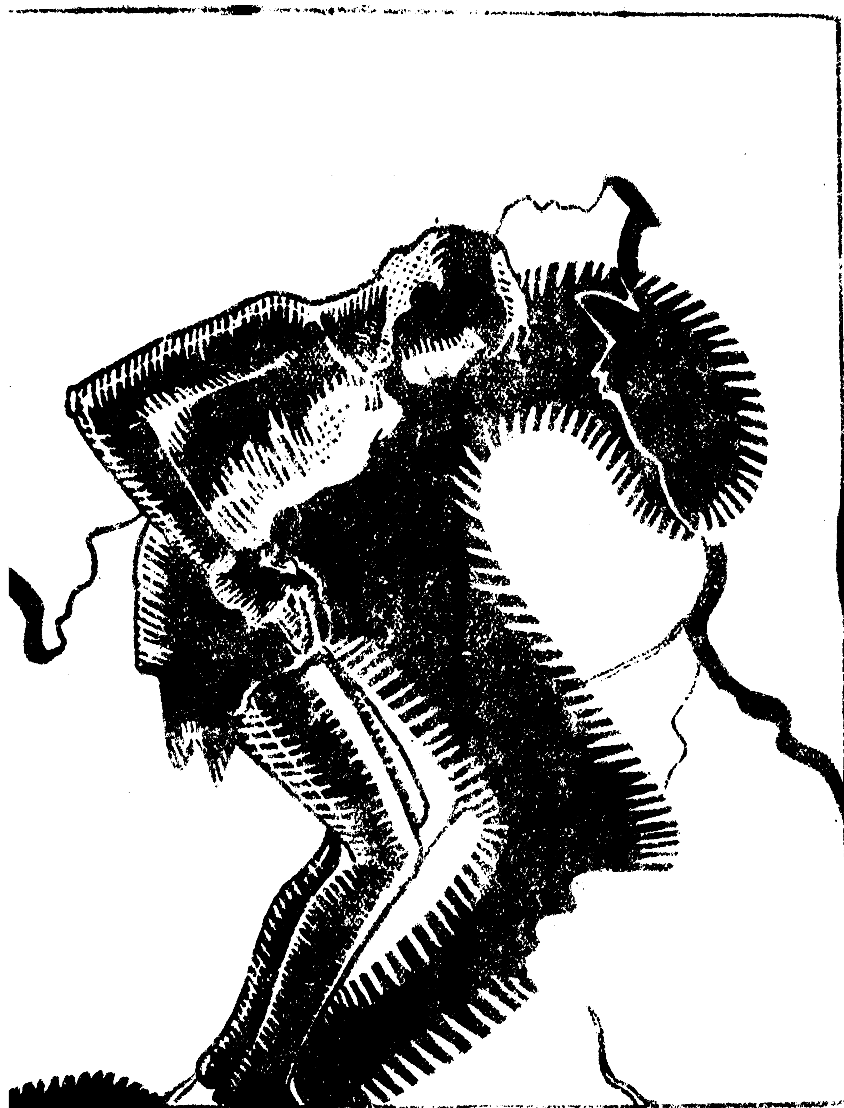
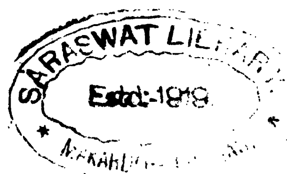


ভাঙ্গনের মুখে বাংলা

ভবানী সেন



ন্যাশনাল বুক এজেন্সী লিমিটেড
কলিকাতা

প্রকাশক:
সুরেন দত্ত
ন্যাশনাল বুক এজেন্সী লিমিটেড
১২, বঙ্কিম চাটার্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা

দ্বিতীয় সংস্করণ
আগষ্ট ১৯৪৫
দাম চারি আনা

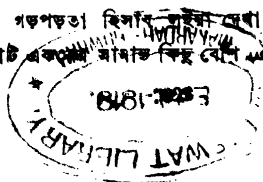
মুদ্রাকর:
শ্রীকিশোরীমোহন নন্দী
গুপ্তপ্রেস, ৩৭।৭ বেণিয়াটোলা লেন,
কলিকাতা।

বাংলার উপর দিয়া যেন একটা ঝড় বহিয়া গিয়াছে। ১৯৪৩ সালে গ্রামের হাজার হাজার ক্ষুধার্ত নরনারী যখন কলিকাতা শহরে ভিক্ষার জন্য মিছিল করিতে আরম্ভ করে, তখন সমস্ত বিশ্বের কাছে প্রকাশ পায় বিদেশী আমলাতন্ত্রের শাসন-ব্যবস্থার দৈন্য ও দুর্নীতি। ১৯৪৩ সালে সারা বাংলায় ৬ সপ্তাহের খাদ্য কম ছিল। ইহার জন্য সারা বছর এমন ভীষণ দুর্ভিক্ষ চলার কথা নয়। তাহা সত্ত্বেও এক বছরে অনাহারে ৩৫ লক্ষ নরনারী মারা যায় এবং ১২ হইতে ১৫ লক্ষ নরনারী ও শিশু পথের ভিখারী হয়, অন্নের জন্য লোকে স্ত্রীপুত্র বিক্রয় করে এবং নর্দমার ভিতর কুকুরের সঙ্গে উচ্ছিষ্ট লইয়া কাড়াকাড়ি করে; অথচ গভর্নমেণ্ট এবং দেশের শতকরা ৯০ জন এই দশজনকে বাঁচাইল না। দুর্ভিক্ষ-তদন্ত কমিশন বলিয়াছেন যে দুর্ভিক্ষের ফলে ১৫ লক্ষ লোক মারা গিয়াছে, কিন্তু এই দুর্ভিক্ষেই চাউল বিক্রয় করিয়া বড় বড় ব্যাপারীরা অতিরিক্ত লাভ করিয়াছে ১৫০ কোটি টাকা। এই তথ্য হইতেই বুঝা যায় যে, রাজনৈতিক অচল অবস্থা দেশের নীচ লোক ও নীচ প্রবৃত্তিগুলিকেই বলশালী করিয়াছে ও সমাজের অঙ্গে ক্ষয় ধরাইয়াছে।

বিদেশী শাসন ও জমিদারি প্রথা বাংলার কৃষক ও শিল্পজীবীদের শোষণই করিয়াছে, বাংলার কৃষি ও শিল্প গড়িয়া তোলে নাই। এই দুই বোঝার চাপে বাংলার এক বিরাট জনসঙ্ঘ অর্দ্ধাহারে কিংবা স্বল্পাহারে দিন কাটায়। যুদ্ধের সময় তাহার উপর যখন নূতন অভাব চাপিল, তখন লাখে লাখে মৃত্যু ছাড়া তাহাদের গতি ছিল না। ১৯৩৪ সালের দুর্ভিক্ষে যাহারা মরিয়াছে তাহাদের ভিতর কৃষক এবং ক্ষেত-মজুরের সংখ্যাই সব চেয়ে বেশি। আজও যাহারা দুস্থ হইয়া রহিয়াছে তাহাদের বেশির ভাগ লোক কৃষক এবং ক্ষেত-মজুর। খাদ্য যাহারা উৎপন্ন করে তাহারাই খাদ্যের অভাবে সকলের আগে এবং সবচেয়ে বেশি আঘাত পাইল কেন? বাংলার ৬ কোটি অধিবাসীর ভিতর প্রায় ৪॥ কোটি চাষী এবং বাংলায় যত চাষের জমি আছে তাহার শতকরা ৯০ ভাগে ধান হয়। অথচ এই দেশেই এত বড় দুর্ভিক্ষ কেন হয়?

জমিদারি প্রথার পরিণাম

মন্বন্তরের বছর পর্য্যন্ত ২০ বছরের গড়পড়তা হিসাব লইয়া দেখা গিয়াছে যে, বাংলায় ধানের জমির পরিমাণ ২ কোটি একরের আরও কিছু বেশি এবং তাহাতে



যে-চাউল উৎপন্ন হয় তাহার পরিমাণ প্রায় ২৩ কোটি মণ। বাংলার ৬ কোটি লোকের জন্ত বছরে চাউল লাগে ৩০ কোটি মণ,কোনো কোনো মতে ২৭ কোটি মণ। বছর বছর খাদ্যের এত ঘাটতি, অথচ বাংলায় জমি আছে যথেষ্ট। ফ্লাউড কমিশনের তদন্তেই প্রকাশ পায় যে, এখনও বাংলায় ৩৭ লক্ষ একর চাষের যোগ্য জমি পতিত রহিয়াছে। সরকারি হিসাব অনুসারে প্রতি একরে ১২·৪ মণ করিয়া চাউল হয়। ৩৭ লক্ষ একর জমিতে যদি চাষীরা চাষ করিতে পারে, তাহা হইলে আরও প্রায় ৫ কোটি মণ চাউল পাওয়া যায়। অথচ এত জমি পড়িয়া রহিয়াছে শুধু এই জন্ত যে, জমির মালিক জমিদার, সে চাষের জন্ত জমির পিছনে এক পয়সাও খরচ করিবে না। সে চায় যে কৃষক সেলামি দিক, খাজনা দিক, জমি বন্দোবস্ত করিয়া নিজে টাকা খরচ করিয়া জমির আগাছা দূর করুক, জলসেচনের ব্যবস্থা করুক এবং সার দিক। কিন্তু বাংলার চাষীর অত সামর্থ্য নাই; যে-জমিতে নদী-নালা প্রভৃতি স্বাভাবিক সেচের ব্যবস্থা আছে সেই জমিতেই চাষ হয়, যে-জমিতে পয়সা খরচ করিয়া সেচের ব্যবস্থা করিতে হয় সেই জমিতে আর চাষ হয় না। বাংলার সমস্ত আবাদী জমির শতকরা মাত্র ৬·২ ভাগ জমিতে সরকারি সেচের ব্যবস্থা আছে, অথচ এই ভারতবর্ষেরই অন্যান্য জায়গায় সরকারি টাকায় ঢের বেশি জমিতে সেচের ব্যবস্থা হইয়াছে।
পাঞ্জাবে সমস্ত আবাদী জমির শতকরা ৫৫ ভাগে এবং মাদ্রাজে শতকরা ৩৩ ভাগে সেচের ব্যবস্থা আছে। বাংলার অফুরন্ত নদী ও খাল-বিল সেচের খরচ স্বভাবতই কমাইয়া দিয়াছে; তবু ৩৭ লক্ষ একর জমি সেচ ও সারের অভাবে পতিত আছে, কারণ সরকার ও জমিদারের প্রধান স্বার্থ কৃষকের নিকট হইতে কর আদায় করা, জমির জন্য অর্থ ব্যয় কেহ করে না।

সাম্রাজ্যবাদী ও জমিদারী শোষণের চাপে বাংলার অধিকাংশ চাষী এত গরীব হইয়াছে যে, তাহাদের মাথা পিছু যে-জমি আছে তাহা অতি সামান্য, এত সামান্য যে বছরের খোরাকি তাহাতে হয় না, খাদ্যের জন্য তাহাদিগকে বাজারের উপর নির্ভর করিতে হয়। বাজারে যত চাউল উঠে তাহার অধিকাংশের মালিক দেশের মুষ্টিমেয় জমিদার, জোতদার অথবা আড়তদার। যে জমি চাষ করে তাহারই ঘরে

যদি সম্বৎসরের খাবার ফসল উঠিত তাহা হইলে চাউলের দর ১০০ টাকা হইলেও চাষীর কোনো ক্ষতি হইত না। কিন্তু জমিদারি প্রথার অধীনে চাষী গত এক যুগ ধরিয়া ক্রমশ গরীব হইতেছে, গরীব চাষীর জমি বেহাত হইয়া গিয়াছে, চাষীদের অধিকাংশই এখন বাজার হইতে চাউল কিনিতে বাধ্য হয়। কত ঘর চাষীর কত জমি আছে ফ্লাউড্ কমিশনের রিপোর্টে তাহার নিম্নলিখিত বিবরণ পাওয়া যায় :—

(ক)	২	একরের কম জমি আছে		শতকরা	৪৬	পরিবারের
	২-৩	একর	"	"	১১.২	"
(খ)	৩-৪	"	"	"	৯.৪	"
	৪-৫	"	"	"	৮.০	"
(গ)	৫-১০	"	"	"	১ .০	"
	১০ একরের বেশি	"		"	৮.৪	"

আড়াই বা তিন একর জমি না থাকিলে একটা পরিবারের সম্বৎসরের প্রয়োজনীয় ধান পাওয়া যায় না। শতকরা ৫৭টি পরিবারের কাহারো ৩ একরের বেশি জমি নাই। দুর্ভিক্ষের প্রথম ধাক্কাতেই ইহারা ঘায়েল হইয়াছে।

প্রতি বছর সমস্ত উৎপন্ন চাউলের মধ্যে প্রায় ১০ কোটি মণ চাউল বাংলার বিভিন্ন বাজারে কেনা বেচা হয়। এই চাউল বিক্রয়ের বাজার কাহাদের দখলে ? উল্লিখিত তালিকায় যাহারা (ক) শ্রেণীভুক্ত তাহারাই কৃষকদের শতকরা ৫৭ জন। চাউল বিক্রয়ের বাজার তাহাদের দখলে নয়। বিশেষজ্ঞরা বলেন যে, ৩ একর জমি থাকিলে একটা গড়পরতা পরিবার তাহার বাৎসরিক প্রয়োজনীয় ধান পায়, কিন্তু ৫ একর জমি লাগে একটা পরিবারের সমস্ত ব্যয় কুলাইবার জন্য। ৫ একরের কম জমি যাহার আছে সে কিছুই বিক্রয় করিতে পারে না, বরং তাহাকে বাজার হইতে চাউল কিনিতে হয়। সে অন্যান্য খরচ চালাইবার জন্য অনেক সময় বছরের প্রথমেই যে-দর পায় সেই দরেই বেচিতে বাধ্য হয়, বছরের প্রথমে নগদ টাকার আশায় সে যে-দর পায় সেই দরেই বিক্রয় করে, মজুত করিয়া দর বাড়ানো তাহার পক্ষে সম্ভব নয়। সে শুধু চাষেরই মালিক, দরের মালিক নয়। যাহাদের জমি ৫ একরেরও বেশি তাহারাই বাজারে নিশ্চিন্ত মনে মুনাফার আশায় ইচ্ছা করিয়া চাউল আটকাইয়া রাখিতে পারে, দর বেশি চড়িলে বিক্রয় করিতে পারে। ইহাদের সংখ্যা চাষীদের মাত্র শতকরা ২৫ জন (উল্লিখিত তালিকার (গ) শ্রেণীভুক্ত)। ৬ কোটি মণ চাউলের বাজার ইহারা দখল করে, ইহাদের

অধিকাংশই জোতদার। ইহারা যখন দেখিল বিদেশ হইতে আমদানি বন্ধ, ধানের দর বাড়িতেছে, তখন বিক্রয় বন্ধ করিল ; যাহারা বেচিল তাহারা ব্যাপারীদের নিকট বেচিল। ব্যাপারীরা অতিরিক্ত লাভের আশায় সেই চাউল আটকাইয়া রাখিল, সাধারণ লোকের নিকট হইতে খাদ্য অদৃশ্য হইয়া গেল।

কৃষকের ঘরে খাদ্য নাই

যে মাসে যখন রাস্তায় ঘাটে মানুষ মরিতে আরম্ভ করিল, শহরের রাস্তায় রাস্তায় যখন দুস্থের ভিড় জমিল, তখন শতকরা ৭৫ জন চাষীর ঘরে খাদ্য ছিল না, খাদ্য ছিল জোতদার আর ব্যাপারীদের হাতে এবং সরকারি এজেন্ট ও কারখানার মালিকদের হাতে। জমিদার জোতদার আর ব্যাপারীরা গ্রামের বাজারে কৃষকদের ফসলের মালিক, তাহাদের হাতেই বাজারের দখল। ১৯৪৩ সালে চাউলের যখন অনটন দেখা দিল, তখন তাহারাই হইল সারা বাংলার ভাগ্য-বিধাতা।

প্রতি বছর বাংলায় চাউলের ঘাটতি প্রায় ৫ কোটি মণ। তাহা সত্ত্বেও প্রতি বছর দুর্ভিক্ষ হয় না দুইটি কারণে। প্রথমত, বিদেশ হইতে চাউল আমদানি হয় ; তাই বলিয়া কোনো বছর ৫ কোটি মণ চাউল আমদানি হয় না ; কিন্তু সামান্য হইলেও চাউল আমদানির সম্ভাবনা থাকে বলিয়াই জোতদার আর ব্যাপারীরা বেশি দিন চাউল আটকাইয়া রাখিতে সাহস পায় না, নিয়মিত ভাবে চাউল বাজারে আনে। দ্বিতীয়ত, এদেশে চিরকাল বহু লোক কিছু-না-কিছু দিন অনশনে থাকে।

দুর্ভিক্ষের অবস্থা আগে হইতেই কী রকম প্রস্তুত হইয়াছিল তাহার কতকটা বিবরণ পাওয়া যায় একটা সরকারি কমিটির রিপোর্ট হইতে। এই কমিটি দুর্ভিক্ষের আগেই ধান এবং চাউলের অবস্থা সম্পর্কে তদন্ত করিবার জন্য নিযুক্ত হইয়াছিল। এই রিপোর্ট হইতে জানা যায় যে, ঢাকা জেলায় প্রয়োজনীয় খাদ্যের শতকরা ৩০ ভাগ মাত্র উৎপন্ন হয়। সিরাজগঞ্জের কৃষকদের ঘরে তখন ৬ মাসের বেশি খাদ্য নাই, বাকি ৬ মাসের জন্য তাহাকে ঋণ গ্রহণ করিতে হইবে। কিশোরগঞ্জের শতকরা ৭০ জন চাষী দেনায় ডুবু-ডুবু, শতকরা মাত্র ৫ জনের ঘরে বিক্রয় করিবার মত উদ্বৃত্ত ধান আছে, শতকরা ২০ জনের ঘরে যে-ধান আছে তাহাতে কোনোমতে বছর চলিয়া যাইবে। বাকি সবাইকে ধান কিনিতে হইবে অথবা ধার করিতে হইবে। নদীয়া

জেলায় শতকরা ২৫ জনের জমি নাই। শতকরা ৫০ জনের ঘরে ৬ মাসের বেশি খাদ্য নাই। বাঁকুড়া জেলায় শতকরা ৬০ জনের ঘরে ৬ মাসের খাদ্য আছে। এই সব খবর জানিয়াও গভর্নমেণ্ট সময়মত খাদ্য সরবরাহের কোনো বন্দোবস্ত করে নাই। এদিকে গভর্নমেণ্ট ডিনায়েল পলিসি অনুসারে সমুদ্রতীরের অঞ্চলগুলি হইতে প্রায় ১লক্ষ মণ চাউল সরাইয়া আনে, অথচ সেই সব অঞ্চলে সরবরাহের কোনো ব্যবস্থা থাকে না।

এই ভাবে দারিদ্র্য এবং অনশনের যে-চাপ আছে তাহার উপর নতুন চাপ আসিল ১৯৪৩ সালে। উৎপাদন কম, আমদানি বন্ধ, দাম চড়া, সরকারের নিন্দনীয় অব্যবস্থা এবং কুব্যবস্থা—এই চাপ আর গরীবেরা সহ্য করিতে পারিল না। জোতদার এবং ব্যাপারীদের হাতে চাউল থাকা সত্ত্বেও দুর্ভিক্ষ দেখা দিল খুব ব্যাপকভাবে।

দুর্ভিক্ষ-তদন্ত কমিশন তাঁহাদের রিপোর্টে বলিয়াছেন, চাউল একেবারেই ছিল না বলিয়া যে দুর্ভিক্ষ হইয়াছে তাহা নয়, চাউলের দর অসম্ভব মাত্রায় বেশি হইয়াছিল বলিয়াই দুর্ভিক্ষ। অর্থাৎ মজুতকারীরা মজুত করিয়া এই দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করিয়াছিল, উৎপাদন কম হইলেও যাহা ছিল তাহা অতিরিক্ত মুনাফাখোরের গুদামে আটক ছিল।

বিলিব্যবস্থার ভার পড়িল এমন এক আমলাতন্ত্রের হাতে যাহার আগা হইতে গোড়া পর্য্যন্ত দুর্নীতিতে ভরা, জনসেবা যাহার লক্ষ্য নয়, যাহার লক্ষ্য শোষণ এবং দমন। কংগ্রেস, লীগ ও মহাসভা তখন আত্মকলহে নিযুক্ত, অধিকাংশ স্বদেশসেবক তখন ভাবিতেছেন খাদ্য বিতরণের ক্ষেত্রে আমাদের কিছুই করিবার নাই। দুর্ভিক্ষ তাই দাবানলের মত বাংলার সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িল।

চাষীর জমি গিয়াছে

চাষীর মায়া প্রাণের চেয়েও জমির উপর বেশি। অভাবের সহস্র তাড়না সহ্য করিয়াও সে জমি আঁকড়াইয়া পড়িয়া থাকে। ঘরের সমস্ত সম্বল বিক্রয় করিয়া যখন আর কিছু ছিল না, তখনই সে জমি বিক্রয় করিয়া জান বাঁচাইবার চেষ্টা করিয়াছে। এমনিভাবে যাহারা জমি হইতে উৎখাত হইয়াছে তাহাদের ভিতর সাড়ে ১৫ লক্ষ

এখনও প্রায় দুস্থ অবস্থায় দিন কাটাইতেছে। সরকারি সাব-রেজিস্টারদের আপিসের বিবরণ হইতেই জানা যায় যে, ২৫০ টাকা বা তাহার কম দামে যে-সব জমি বিক্রয় হইয়াছে সেই সব জমির মোট বিক্রয়ের মূল্য ১০ কোটি টাকা। অর্থাৎ ১৯৪৩ সালে গরীব চাষীরা অন্তত ১০ কোটি টাকার জমি বিক্রয় করিয়াছে (৯ পৃষ্ঠা দেখুন)। এই হিসাব শুধু দুর্ভিক্ষপীড়িত দুস্থ অঞ্চলগুলির হিসাব।

যে-কৃষকেরা এইভাবে জমি হারাইয়াছে তাহাদের শতকরা একজনের বেশি দুর্ভিক্ষের পর জমি ফিরিয়া পায় নাই, এমন কি জমি ফেরত সম্পর্কে সরকারি আইনের সাহায্যেও না। মাত্র ১৫টি এলেকায় এক বছরের ভিতর ৫ লক্ষ কৃষক প্রায় ১০ কোটি টাকার জমি বেচিয়া ফেলিয়াছে। এই অঞ্চলে দখলিসত্ত্ববিশিষ্ট জোত বিক্রয় হইয়াছে ৪,২৬,৬৮৩টি, তাহাও শুধু সেই সমস্ত জমি যাহার দাম ২৫০ টাকার বেশি নয়। বাংলার সবচেয়ে বেশি জমি হস্তান্তরিত হইয়াছিল ১৯২৩ সালে। এই বছর সমগ্র বাংলায় যত দাগ জমি বিক্রয় হইয়াছিল (কেবল ২৫০ টাকার কম নয়) তাহার সংখ্যা ৩,১৪,০০০ ; ১৯২৯ সালের পর অর্থনৈতিক সঙ্কটের কয়েকটা বছরও এই সংখ্যা ২ লক্ষের কম ছিল।

১৯৪৩ সালে জমি হইতে কৃষক উৎখাতের পরিমাণ এত বেশি হইয়াছে যে অতীতে আর কখনও এইরূপ হয় নাই।

বিশেষজ্ঞরা তদন্ত করিয়া বলিয়াছেন যে, শতকরা ৫ জন চাষী তাহাদের সমস্ত জমিজমা বিক্রয় করিয়া দিয়াছে। শতকরা আরও ১১ জন কিছু-না কিছু জমি বেচিয়াছে। এই জমি কিনিয়াছে জমিদার, জোতদার এবং কণ্ট্রাক্টরেরা। যুদ্ধের বাজারে ইহারাই টাকায় লাল হইয়া উঠিয়াছে। যে-সব চাষী জমি বেচিয়াছে তাহাদের অনেকেই চাষ ছাড়িয়া পরের জমিতে মজুরি করা শুরু করিয়াছে, আর সবাই হইয়াছে ভিখারী। একই কৃষির ভিতর ঐশ্বর্য্যের পাশাপাশি দুস্থতা গ্রাম্য জীবনের সরল সম্বন্ধ ভাঙিয়া দিয়াছে। যাহারা ছিল ভাই-ভাই তাহারা হইয়াছে মনিব-চাকর।

জমি আছে তো গরু নাই

উপোস করিয়া ভিক্ষা করিয়াও যাহারা জমি ছাড়ে নাই তাহাদেরও অনেকের ঘরে চাষের বলদ নাই। এমনিতেই বাংলায় গরীব চাষীর বলদ কম, জোতদারদের

১৯৪৩ সালে জমি বিক্রয়ের হিসাব (যে সব জোতের দাম ২৫০ টাকার বেশি নয়)

এলেকার নাম	রায়তী জমি			দখলিস্বত্ব বিশিষ্ট রায়তী জমি		
	বিক্রেতার সংখ্যা	বিক্রয়ের মূল্য (টাকা)	জোতের সংখ্যা	বিক্রেতার সংখ্যা	বিক্রয়ের মূল্য (টাকা)	জোতের সংখ্যা
২৪ পঃ সদর ও ডায়মণ্ডহারবার মহকুমা	১৯,৪৩৮	৪৬,৬৮,১৩২	১৪,৮৪৮	৪,৮৫,৫৮	৯,০৫৫,৯৫১	৩৯০৯১
ফরিদপুর জেলা	১৭,৭০	২,৫১,৪৫২	১,৪৫৩	৮৪,২৫২	১,২০,৭৫,৪৩২	৭৬২০২
কাঁথি, তমলুক মহঃ (মেদিনীপুর)	১২৮,১৮	২৮,৩৬,০৫৮	১০,৯৮৩	৪৯,০৯০	৬৫,৮৭,৮০৫	৪৩৪৪৯
হাওড়া সদর ও উলুবেড়িয়া	৪৭,২৩	১৪,৮২,৮৭৫	৩,৪৫৫	২৮,৮৬০	৫১,২৩,৪৩৩	২০০৮৬
বর্দ্ধমান সদর ও কালনা	৯৪৬২	২১,৪০,৭৩১	৬,৬৯৭	২১,৭৪৫	৪৮,০৮,৪৮৪	১৫৬৬৭
সাতক্ষীরা মহকুমা (খুলনা)	৯,৪০	২,২৪,২৮১	৬৭২	৬৯৯৫	১৮,৯৭,২৩৪	৫১০৪
কাঁদি মহকুমা (মুর্শিদাবাদ)	৩৬,২৪	৪,৮২,৮৬৩	৩০৩০	১৪৬৬২	১৭,৯৫,৮৭৫	১২৭৭০
নিলফামারী (রংপুর)	৪৩৪	৬১,৪৯৫	৩৭০	৩৩২৬৮	২৭০৬৩৮১	৩১৯৯৭
নারায়ণগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, মুন্শিগঞ্জ	৯৯৬	২,১৯,৬৩৭	৬৭১	১,১২,৯১৭	২,৩২,০৭,৪১২	৮৭০৮৯
নোয়াখালি জেলা	২৭২৮	৩,৪১,৩২৪	২১০২	২২,৩৮৪	৩৪,৮২,০৪৪	১৯০১১
হুগলী সদর ও আরামবাগ	১৫৭২	৩,৮৫,৯৫৪	১১৭৭	৯৭৩৬	১৭,২১,০৫২	৬১১১
চট্টগ্রাম জেলা	২২৭	৮১৪০৫	১৮০	১৩৪৪৩	২২,০৮,২১৫	১১৫০১
বাখরগঞ্জ সদর ও ভোলা	৪০১	৯২৩৬৩	৩২৫	২৯,৩৩৮	৫৯,০৪,৪৩০	১৩৯৩৫
টাঙ্গাইল মহকুমা (ময়মনসিংহ)	১৩২	২৬০২৮	৩৮	১৯২২৪	৩১,১৭,৩৬৬	১৭৬৪৯
চাঁদপুর মহকুমা (ত্রিপুরা)	১১৭১	১,৮৬,৬৪১	৭৫৭	২৩,৪০৫	৫২,১২,৯৮৩	১৭০২১
মোট	৬০৪৩৬	১৩৪৮১২৩৯	৪৬৭৫৮	৫১৩৮৩১	৮৮৯০৩০৭৯	৪২৬৬৮৩

হাতেই বলদ বেশি। যে-সমস্ত লোক কৃষিকার্য্যে নিযুক্ত আছে তাহাদের ৫ ভাগের ১ ভাগ লোকের হাতে বাংলার সমস্ত চাষের গরুর অর্দ্ধেক। বাকি অর্দ্ধেকের মালিক ৫ ভাগের ৪ ভাগ লোক। এই গরীবেরাই স্ত্রীপুত্রের ক্ষুধার কান্না সহ্য করিতে না পারিয়া বলদ বেচিয়া দিয়াছিল। ১৯৪৩-৪৪ সালে বাংলায় চাষের যোগ্য সমস্ত বলদের শতকরা ২০ ভাগ হয় অকৃষকের হাতে বিক্রয় হইয়া গিয়াছে অথবা মহামারির আক্রমণে মরিয়াছে। দুর্ভিক্ষের আগে ৫০ টাকা হইলে যে-বলদ পাওয়া যাইত এখন তাহার দাম ২০০ টাকা। দর দিয়াও সব জায়গায় গরু পাওয়া যায় না, পাওয়া গেলেও অধিকাংশ চাষীর কিনিবার ক্ষমতা নাই। গরু কিনিবার জন্য গভর্নমেণ্ট কৃষকদিগকে ঋণ দিয়াছে, কিন্তু এই ঋণের ভাগ পড়িয়াছে একটি সমগ্র ইউনিয়নে মাত্র ১০০০ টাকা, অর্থাৎ মাত্র ৫টি কি ৬টি গরুর দাম। এই হিসাবে প্রতি ১০০ জন কৃষকের ভাগেও একটি গরু পড়ে না। অনেক ক্ষেত্রে যে দুই-এক জন কৃষক টাকা পাইয়াছে তাহারাও গরু পায় নাই, কারণ গরু সরবরাহের ব্যবস্থা নাই। অভাবের তাড়নায় কৃষক সে-টাকা খরচ করিয়া ফেলিয়াছে। এখন গভর্নমেণ্টের নিকট হইতে মুহুর্মুহু তাগিদ আসিতেছে— 'ঋণ শোধ দাও।' গরু তো মিলিলই না, মাঝখান হইতে ঘাড়ে ঋণের বোঝা চাপিল।

গরুর অভাব এত প্রচণ্ড এবং চাষীর বাঁচিবার ইচ্ছা এত প্রবল যে, কোথাও কোথাও এমন দৃশ্যও দেখা গিয়াছে যে কৃষক নিজের ছেলে কিংবা ভাইয়ের ঘাড়েই জোয়াল চাপাইয়া লাঙল টানাইতেছে। কিন্তু এই রকম সবাই পারে না, তাই গরুর অভাবে জমি অন্যের কাছে বেচিয়া দিয়াছে এমন উদাহরণও কম নয়।

কৃষির অচল অবস্থা

গরু যাহার আছে সে গরুর জন্য পুষ্টিকর খাদ্য জুটাইতে পারে না। খইলের দর মন্বন্তরের বছরেও এক বস্তা দশ এগার টাকা ছিল, এখন সতের আঠার টাকা না হইলে এক বস্তা খইল পাওয়া যায় না। কৃষির যন্ত্রপাতির দাম তিন-চার গুণ বাড়িয়াছে।

গভর্নমেণ্টের কৃষি-গবেষণা বিভাগের হিসাব অনুসারে ১৯৩৭ সালে রাজশাহী ও বগুড়া জেলার ধান চাষের খরচ ছিল প্রতি একরে ১৮'৯ টাকা, বীরভূম জেলায় ছিল ২৫'৮

টাকা। এই হিসাবে চাষের জন্য দরকারি যে-যে জিনিস যে-পরিমাণ ধরা হইয়াছে সেই সেই জিনিস সেই পরিমাণে ধরিয়া আমরা ১৯৪৪ সালের চাষের খরচ হিসাব করিয়া দেখিয়াছি। ১৯৪৪ সালে রাজশাহী-বগুড়াতে এক একর জমি চাষের খরচ ৫৭'৬ টাকা এবং বীরভূমে ৬৭'৯ টাকা। এই হিসাবে প্রতি মণ ধান পয়দা করার খরচই পড়ে প্রায় ৫ টাকা। কোনো কোনো জেলায় এক মণ ধানের খরচ ৭ টাকা পর্য্যন্ত পড়ে। এইরূপ অবস্থায় মজুর খাটাইয়া জমি চাষ করিয়া চাউল বিক্রয় করিয়া লাভের ব্যবসায় করিতে গেলে চাউলের দর এত বেশি হয় যে দেশের গরীব জনসাধারণ সেই দরে চাউল কিনিয়া খাইতে পারে না।

স্বাভাবিক অবস্থায় গরীব চাষী জমি বেচিয়া ফেলিলেও জোতদারেরা সেই জমি কিনিয়া কৃষিতে লাভের ব্যবসায় চালাইয়াও সস্তা দরে খাদ্য সরবরাহ করিতে পারিত। কিন্তু বর্ত্তমানে সে-অবস্থা নাই।

গরীব চাষীর জমি জমিদার, জোতদার ও কণ্ট্রাক্টরদের হাতে চলিয়া যাইতেছে। তাহারা যদি মজুর খাটাইয়া ব্যাপকভাবে লাভের ব্যবসায় আরম্ভ করে, তাহা হইলে খাদ্যের দর বাড়িবে বই কমিবে না, অথচ গরীব চাষী নিজের হাতে জমি রাখিতে পারিতেছে না। কৃষির যন্ত্রপাতি, গরু, সার প্রভৃতি সমস্তই বাজার হইতে অদৃশ্য। ইহাই হইল কৃষির অচল অবস্থা।

তাই বলিয়া আপাতত চাষ বন্ধ হইবে না। কৃষকদের শতকরা ৬৫'৯ জন নিজে ও নিজের পরিবারের লোক লইয়া চাষ করে। ইহারা ফসল বেচিয়া মজুরির খরচ উঠুক বা না উঠুক তবু চাষ করিবে। অন্য কৃষক কিংবা জোতদারও লোকসানের ভয়ে জমি ফেলিয়া রাখে না। গতানুগতিক ভাবে তাহারা চাষ করিয়া যাইবে, কিন্তু এমনভাবে কতদিন চলিতে পারে?

বাঁচিবার তাগিদে কৃষক যেমন করিয়া হউক চাষ করে, জমি পড়িয়া থাকে না। দুর্ভিক্ষের বছরে মরিতে মরিতেও সে প্রত্যেক কাঠা জমিতে ফসল ফলাইয়াছে। ১৯৪৪ সালে দেখা গেল মাঠে মাঠে অফুরন্ত ধান। মাঠে ফসল ফলিতেছে এবং বাজারে চাউল উঠিতেছে, ইহাই আমরা দেখি; কিন্তু আমরা দেখি না সেই সঙ্গে কৃষকের জীবনে আর গ্রাম্য সমাজে কী পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে। স্বত্ববান কৃষক আজ জমির জন্য, গরুর জন্য, খইলের জন্য, বীজের জন্য গ্রামের অবস্থাপন্ন চাষী কিংবা জোতদারের

উপর নির্ভরশীল। যে-কোন শর্তে আত্মবিক্রয় করিয়া সে জমি, গরু ও বীজ জোগাড় করিবে অথবা জনমজুরে পরিণত হইবে। স্বত্ববান কৃষক জনমজুর, ঋণদাস কিংবা ক্রীতদাসে পরিণত হইতেছে। বাংলার গ্রাম্য সমাজ প্রধানত কৃষক স্বত্বাধিকারীর সমাজ—সেই সমাজ এখন ভূমিদাসের সমাজে পরিণত হইতে চলিল।

ঘরে ঘরে অভাব ও অশান্তি

কৃষক, কারিগর কি মধ্যবিত্ত কাহারো ঘরে আজ শান্তি নাই। কলিকাতায় রেশনিং আছে, তাই চোরাকারবারীরা এবার আর চাউল লইয়া সরিয়া পড়িতে পারে নাই। গত বছর প্রচুর ধান পয়দা হইয়াছিল, কাজেই গ্রামে-গ্রামে চাউল সরবরাহের দায়িত্ব সরকার না লইলেও মন্বন্তর দেখা দেয় নাই। কিন্তু তাই বলিয়া জীবন ধারণের ব্যয় কমে নাই, বরং' ৪৩ সালের তুলনায় আরও বাড়িয়াছে।

কাপড় কলিকাতাতেই পাওয়া যায় না, মফঃস্বলের তো কথাই নাই। চোরাবাজারে কাপড়ের জোড়া বিশ টাকা হইতে পঁচিশ টাকা, তাহাও ভাগ্যবান ধনী ছাড়া আর কাহারো পক্ষে পাওয়া অসম্ভব। কাপড়ের অভাবে গ্রাম্য রমণী অর্দ্ধনগ্ন অবস্থায় থাকে, স্বামী স্ত্রীকে তালাক দেয় এমন খবরও শুনা গিয়াছে। ভদ্রমহিলাদের ছেড়া লেপের ওয়াড় কিংবা নেংটি পরিতে হইতেছে, এই খবরও বিরল নয়। ১৯৪৩ সালে চাউলের কিউতে যে-রকম ভিড় এবং ধ্বস্তাধ্বস্তি হইত, ১৯৪৫ সালে কাপড়ের কিউতে সেই রমক ভিড় এবং ধ্বস্তাধ্বস্তি আরম্ভ হইয়াছে। গভর্নমেণ্ট অবশ্য ঘোষণা করিয়াছেন যে, কলিকাতার বাসেন্দাদের জন্য কাপড়ের রেশানিং হইবে; কিন্তু মফঃস্বলের বাসেন্দাদের জন্য এখনও পর্য্যন্ত অবস্থা অনুযায়ী কোনো ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয় নাই।

সরিষার তৈল বাজার হইতে অদৃশ্য হইতেছে। সরিষার তেলের কণ্ট্রোল-দর ১।/১০, কিন্তু কণ্ট্রোল-দরে তেল পাওয়া যায় না, চোরাবাজারে তেলের সের দুই টাকা। নুনের কণ্ট্রোল-দর ৶১০, কিন্তু অধিকাংশ লোককে চোরাবাজার হইতে ।৶০ সের দরে নুন কিনিতে হয়। ১৯৪৪ সালে নুনের সের টাকা টাকা পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল, রেশনিং হইবার পর চোরাবাজারের দর নামিয়াছে। চিনির সরবরাহ কমিয়াছে। গ্রামের লোক ভাল চিনি পায় না, এক টাকা সের দরে ময়লা অখাদ্য চিনি তাহাদের কিনিতে হয়। চিনি এবং নুনের জন্য গ্রামে রেশনিং-এর ব্যবস্থা

আছে, কিন্তু গ্রামের প্রতিপত্তিশালী লোকেরাই তাহা পায়, অশিক্ষিত গরীবেরা তাহা পায় না। মাছ এবং দুধ খাওয়া মধ্যবিত্ত গৃহস্থদেরও এক রকম ছাড়িয়া দিতে হইয়াছে। এই অভাবের আঘাত প্রত্যেক পরিবারের উপরই পড়িয়াছে, মধ্যবিত্ত পরিবার এই আঘাতে যত আহত হইয়াছে এত আর কিছুতে হয় নাই। তাহাদের আয় যাহা বাড়িয়াছে তাহার চেয়ে ব্যয় বাড়িয়াছে অনেক বেশি। গ্রামের প্রতি গরীব পরিবারে তাই দেনার বোঝা বাড়িয়া উঠিয়াছে। কৃষক-সমিতির কর্ম্মীরা যে-তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন তাহা হইতে জানা যায়, দুর্ভিক্ষে বেশি রকম ভাবে পীড়িত অঞ্চলগুলিতে কী ভাবে দেনা বাড়িয়াছে :—

পরিবারের বিবরণ	১৯৪৩ সালে শতকরা কত পরিবার ঋণগ্রস্ত	১৯৪৪ সালে শতকরা কত পরিবার ঋণগ্রস্ত
কৃষক পরিবার	৪৩	৬৬
বিভিন্ন কারিগর	২৭	৫৬
বিবিধ	১৭	৪৬

এই বিবরণ হইতে কয়েকটি সিদ্ধান্ত বেশ স্পষ্ট হইয়া উঠে। প্রথমত, বর্ত্তমানে গ্রামগুলির অর্দ্ধেকের বেশি লোক গ্রামের এক অংশের নিকট ঋণগ্রস্ত। দ্বিতীয়ত, ১৯৪৩ সালের পর গত এক বৎসরে গ্রামবাসীদের ঋণের পরিমাণ অনেক বাড়িয়াছে। তৃতীয়ত, বিবিধ মধ্যবিত্ত পরিবারের ঋণ আজকাল আর সকলের চেয়ে বেশি বাড়িয়াছে। জীবন ধারণের সম্পদ দিন দিন কমিতেছে, কারণ ব্যয় দিন দিন বাড়িতেছে। এই দেনার হাত হইতে অব্যাহতি পাইবার কোনো উপায় নাই। এই দেনার পরিণাম হইবে এই যে, গ্রামের এক অংশ ধনীর নিকট অধিকাংশ গ্রামবাসী দেনার দাসত্বে বাঁধা পড়িবে।

মধ্যবিত্ত পরিবার সঙ্কটের আঘাতে ছত্রভঙ্গ হইয়া যাইতেছে। গত অর্দ্ধ শতাব্দী ধরিয়া বাংলার একান্নবর্ত্তী মধ্যবিত্ত পরিবারগুলি ভাঙিয়া যাইতেছিল, এবারকার সঙ্কটে সেই ভাঙনের মাত্রা হঠাৎ বাড়িয়াছে। যে-কোনো রকমে হউক বাঁচিতে হইবে, ইহাই হইল প্রত্যেক মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের সমস্যা। স্কুলে, সাহিত্যসেবায়, ছোটখাটো ব্যবসায়ে এবং মফঃস্বলের সাধারণ চাকুরিতে যে-আয় হয় সে-আয়ে আজকাল কাহারো পোষায় না, সে-আয়ে একজন অভিভাবক পাঁচ জন

পোষ্য পোষণ করিতে পারে না, তাই যে যাহার নিজের ভাগ্য লইয়া দিকে দিকে উপার্জ্জনের আশায় ছুটিতেছে। যাহাদের কোনো আয় নাই তাহারা আত্মীয়-স্বজনের কাছে আগেকার মত সাহায্য পায় না। আত্মপরায়ণতা, স্বার্থপরতা এবং ক্ষুদ্রতা তাই মধ্যবিত্ত পরিবারের শান্তি ও সরলতা নষ্ট করিয়া ফেলিতেছে।

গত এক শতাব্দী ধরিয়া শিক্ষিত মধ্যবিত্তের দানে বাংলার শিক্ষা ও সংস্কৃতি গড়িয়া উঠিয়াছে। তাহার উদ্যোগে, সেবায় এবং যত্নে গ্রামাঞ্চলে সহযোগিতার জীবন বাঁচিয়া আছে; গ্রামের লাইব্রেরি, খেলাধুলা, আমোদ-প্রমোদ, পূজাপার্ব্বণ সামাজিক জীবনে শক্তি সঞ্চার করিতেছে। আজ সেই মধ্যবিত্তের জীবন ভাঙনের দশায় উপস্থিত; গ্রামের স্কুল, গ্রামের খেলাধুলা ও আমোদ-প্রমোদ, গ্রামের লাইব্রেরিগুলি আজ অধিকাংশ স্থানে অনাদৃত। গ্রাম্য জীবনের ভিতরে ভিতরে একটি দারুণ পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে; এই পরিবর্ত্তন ভালোর দিকে নয়, ভাঙনের দিকে।

গ্রাম্য শিল্প-জীবীদের লোপ

জীবন ধারণের জন্য গরীব চাষী তাহার যেটুকু সম্বল আছে তাহা লইয়া লড়াই করিতেছে; শিক্ষিত মধ্যবিত্তের অনেকেই দেশবিদেশে চাকুরির জন্য অক্লান্তভাবে পথ খুঁজিতেছে। মৎস্যজীবী, মুচি, কামার, কুমার, তাঁতী প্রভৃতি গ্রাম্য কারিগরেরা শ্রেণী হিসাবে একেবারে লোপ পাইতে বসিয়াছে। দুর্ভিক্ষের আঘাত ইহারাই সবচেয়ে বেশি পাইয়াছিল; আজও সমাজজীবনে ফিরিয়া আসিতে ইহারাই সব চেয়ে বেশি বাধার সম্মুখীন।

চট্টগ্রামে ২৯০০০ মৎস্যজীবীর বাস। দুর্ভিক্ষের সময় ২৫০০০ মৎস্যজীবী লঙ্গরখানার দ্বারস্থ হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে প্রায় ৮০০০ লোক অনাহারে মরিয়াছে। বাকি সব আজও প্রায় দুস্থ অবস্থায় ঘুরিতেছে। ঘর নাই, জাল নাই, নৌকা নাই, পরিবার ভাঙিয়া গিয়াছে, পরিজনেরা পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন—এই হইল চট্টগ্রামের জল-দাসদের অবস্থা। জেলেদের এই অবস্থা শুধু চট্টগ্রামে নয়, বাংলার প্রায় সকল জেলাতেই। নদীয়া জেলার একটি গ্রাম সম্বন্ধে জনৈক স্থানীয় কর্ম্মী নিম্নলিখিত বিবরণ দিয়াছেন:—"নদীয়া জেলার গাদগাছা গ্রাম। ৩০ ঘর লোকের বসতি। ১৯৪২ সালে মোট লোক ছিল ১৪৯ জন। বর্ত্তমানে ৯৮ জন গ্রামে আছে, তাহার ভিতর ৩৮ জন বালক-বালিকা। ...দুর্ভিক্ষের বছরের ভিতর জাল, সুতা, নৌকা

ইত্যাদি খোয়াইয়াছে। এই অঞ্চলের বিলগুলি জমিদার ও বড় বড় ইজারাদারদের হাতে গিয়া পড়িতেছে। জেলেরা মাছ ধরিতে চাহিলে খাজনা দিতে হয়, খাজনার পরিমাণ অত্যন্ত বেশি।"—জনযুদ্ধ, ৬ই ডিসেম্বর, ১৯৪৪। ঢাকা জিলার কুমার-ভোগ ইউনিয়নের একটি জেলে পাড়ায় ৫০ ঘরের মধ্যে বাকি আছে ৩০ ঘর। অর্দ্ধেক লোকই মারা গিয়াছে। মাত্র ৫।৭টি ঘরে জাল আছে, নৌকা এক জনেরও নাই। নৌকা ভাড়া করিবার সঙ্গতি এক জনেরও নাই। দক্ষিণ মেদিনীমণ্ডলের জেলে পাড়ায় ৩ ভাগের ২ ভাগ মাত্র লোক বাঁচিয়া আছে।

ঋষি, ছুতার, ধোপা প্রভৃতি জাতি জেলেদের মতই নিঃসম্বল। 'জনযুদ্ধ' পত্রিকার ৩য় বর্ষ ৭ম সংখ্যায় সুভাষ মুখোপাধ্যায় ঢাকা জেলার বিক্রমপুরের গ্রাম্য জীবন সম্পর্কে নিম্নলিখিত বিবরণ দিয়াছেন :

"রাত্রে আর ঋষিপাড়া ঢাকের শব্দে মুখর হয় না। আগে চাটগাঁ, ময়মনসিংহ প্রভৃতি জায়গা হইতে ঢাকের বায়না আসিত ; আজকাল পূজাপার্ব্বণ প্রায় উঠিয়া গিয়াছে। গ্রামে বিবাহাদি সিকিভাগও হয় কিনা সন্দেহ। চামড়ার কাজ প্রায় বন্ধ। পাট ও পাল্লা তৈয়ারের কাজও আজ অচল হইয়া পড়িয়াছে। বেতের পণ ৩৲ ও ৩॥০ টাকা। বাজারে ক্রেতা নাই। তাহা ছাড়া যানবাহনের অভাবে আসাম হইতে বেতের চালানও আসে না, ফরিদপুরের যে-অঞ্চলে বেত পাওয়া যায় সেখানে ম্যালেরিয়া এত বেশি যে লোকে সেখানে যাইতে ভরসা পায় না। টঙ্গিবাড়ী গ্রামের ঋষিপাড়া প্রায় সাফ হইয়া গিয়াছে।"

গ্রাম্য কারিগরদের মধ্যে তাঁতীদের অবস্থাই এতকাল সবচেয়ে ভাল ছিল। বাংলায় ২ লক্ষ তাঁতী আছে, পরিবার পরিজন সমেত তাহাদের মোট সংখ্যা ১২ লক্ষ। বাংলায় যত কাপড় দরকার হয় তাহার ৪ ভাগের এক ভাগ তাঁতীরা সরবরাহ করে। সারা বাংলায় এখন কাপড়ের অভাব, অথচ তাঁতীরা সুতার অভাবে বেকার।

বগুড়া জেলার "দণটিকা গ্রামে ২ শত ঘর তাঁতীর বাস। মোট তাঁতের সংখ্যা ১৭৩ এবং ২৫ জনের ৪।৫ বিঘা করিয়া আবাদী জমি। দুর্ভিক্ষের সময় ৫০ জন লোককে শহরের লঙ্গরখানায় খাইয়া প্রাণ বাঁচাইতে হইয়াছে,অসুখ-বিসুখে মরিয়াছে ৬০ জন। ২৫ জনের মধ্যে ১৩ জনই তাহাদের মোট ৫২ বিঘা জমি বেচিয়া দিয়া দিনমজুর হইয়াছে। প্রায় ১০০ জন তাহাদের তাঁত ২।১ জন বর্দ্ধিষ্ণু তাঁতীর কাছে

বন্ধক রাখিয়া সংসার চালাইয়াছে। শুধু দশটিকা নয়, জেলার সমস্ত গ্রামেই তাঁতীদের আজ এমনি অবস্থা।"—জনযুদ্ধ, (১৫।৩।৪৫)। এই রকম উদাহরণ অনেকগুলি দেওয়া যায়।

তাঁতীর সুতা, কামারের লোহা, জেলের জাল, কুমারের মাটি, মুচির চামড়া—গ্রাম্য কারিগরের প্রয়োজনীয় প্রত্যেকটি জিনিসই চোরাবাজারে। চোরাবাজার হইতে কাঁচামাল সংগ্রহ করিবার মত ভাগ্যবান যাহারা শুধু তাহারাই আজ জাতব্যবসায় চালাইতে পারে, অন্য কেউ পারে না। দুস্থ লোককে সমাজে ফিরাইয়া আনা তো দূরের কথা, সমাজে যাহারা আছে তাহারাও দুস্থ হইতে বসিয়াছে। বিদেশী আমদানি জিনিস এবং দেশী কারখানার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিয়া যে গ্রাম্য শিল্পীরা এতদিন টিকিয়া ছিল, যুদ্ধসঙ্কটের আঘাতে ও দুর্ভিক্ষে তাহারা আজ লুপ্তপ্রায়। দেশে যন্ত্রশিল্প যথেষ্ট পরিমাণে গড়িয়া উঠে নাই; অন্তত এত যন্ত্রশিল্প নাই যে গ্রামের গরীবদের কাজ দিতে পারে অথবা দেশবাসীর প্রয়োজনীয় বস্তুর চাহিদা মিটাইতে পারে; অথচ এদিকে গ্রাম্যশিল্পীর পাট উঠিয়া যাইতেছে, গ্রাম্যশিল্পীরা সহায়হীন সম্বলহীন নিঃস্বে পরিণত হইতেছে।

বিদেশী শাসনে বছরের পর বছর বাংলার অর্থনীতি ও সমাজ অন্তঃসারশূন্য হইয়া উঠিতেছিল, যুদ্ধের সঙ্কট সহ্য করিবার মত ক্ষমতা তাহার ছিল না। বাংলার মাটিতে যুদ্ধ প্রবেশ করে নাই, বিদেশী আক্রমণকারী বাংলার মাটিতে পা দিতে পারে নাই; তথাপি সঙ্কটের আঘাতে বাংলার সমাজ ও অর্থনীতি তাসের ঘরের মত ধ্বসিয়া পড়িতেছে।

দুর্ভিক্ষের ধ্বংসাবশেষ

দুর্ভিক্ষ ভারতবর্ষে অনেক বার হইয়াছে। সে-সব দুর্ভিক্ষ হইল এক বছরের একটা সঙ্কট। ফসলের অভাবে এক বছর অন্নকষ্ট দেখা দিয়াছে, নূতন বছরে নূতন ফসল উঠিলে সে-সঙ্কট কাটিয়া গিয়াছে। কোনো দুর্ভিক্ষই ইহার আগে সমাজের উপর কোন স্থায়ী চিহ্ন রাখিয়া যায় নাই। ১৯৪৩ সালে বাংলার দুর্ভিক্ষ শুধু এক বছরের একটা অন্নসঙ্কট নয়। পরাধীনতার ভিতর আমলাতন্ত্রের শাসনে এবং চিরস্থায়ী জমিদারি প্রথার প্রভাবে বাংলার কৃষি, শিল্প ও সমাজ যে-ভাবে জরাজীর্ণ হইয়াছিল যুদ্ধসঙ্কট

তাহাকেই দুর্ভিক্ষে পরিণত করিয়াছে। মন্বন্তরের ভাঙনে সমগ্র সমাজ নড়িয়া উঠিয়াছে. মন্বন্তরের পরও তাহার ভাঙনের কাজ চলিতেছে। এই ক্ষত আপনা-. আপনি সারিবে না, এই ক্ষত সারিতে অনেক দিন লাগিবে, এই ক্ষত সারিবার জন্ম বাংলার সমাজ আবার নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে।

সরকারি বিবরণ অনুসারে বাংলার ৬ কোটি লোকের মধ্যে ২ কোটি লোকের জীবনে মন্বন্তরের সাংঘাতিক আঘাত লাগিয়াছিল। বাংলা দেশে মোট ৯০ টি মহকুমা আছে। ২৯ টি মহকুমায় দুর্ভিক্ষ ভীষণ ভাবে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। বাংলা দেশের মোট আয়তন ৮২৯৫৫ বর্গ মাইল। ইহার মধ্যে প্রায় ২১৬৬৫ বর্গ মাইলে সমস্ত লোক অত্যন্ত তীব্রভাবে দুর্ভিক্ষের আঘাত পাইয়াছে। (দুর্ভিক্ষ-তদন্ত কমিটির রিপোর্ট, ৯৬ পৃষ্ঠা)।

দুর্ভিক্ষে মারা গিয়াছে মোট ৩৫ লক্ষ লোক। যাহারা বাঁচিয়া আছে তাহারাই আজিকার দিনের সমস্যা। বিধ্বস্ত এলেকার শতকরা ১০ জন লোক আজও দুস্থ, ইহাই বিশেষজ্ঞদের অভিমত। বিশিষ্ট সংখ্যাতত্ত্ববিদেরা হিসাব করিয়া বলিয়াছেন যে, প্রায় ১২ লক্ষ লোক এখনও দুস্থ ভিখারী। একেবারে ভিখারী না হইলেও রিক্ত হইয়া পড়িয়াছে এমন লোকের সংখ্যা ৬০ লক্ষ। তাহাদের মধ্যে ২৭ লক্ষ ক্ষেতমজুর, ১৫ লক্ষ গরীব কৃষক, ১৫ লক্ষ গ্রাম্য শিল্পজীবী এবং ২৫০০০ স্কুলের শিক্ষক। ইহা ছাড়া আরও অন্যান্য শ্রেণীর লোকও আছে। অর্থাৎ প্রায় অর্দ্ধেক বাংলার সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনের প্রধান প্রধান ক্ষেত্র লণ্ডভণ্ড হইয়া গিয়াছে।

আপনা হইতে এই দুস্থদের পক্ষে স্বাভাবিক সমাজজীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়া অসম্ভব, কারণ সমগ্র সমাজজীবনই আজ লণ্ডভণ্ড। কৃষক, কারিগর, মধ্যবিত্ত প্রত্যেকের কর্ম্মক্ষেত্রই আজ টলমল, প্রত্যেকেই ব্যক্তিগতভাবে দুর্দ্দান্ত জীবন-সংগ্রামে লিপ্ত।

সমাজের প্রত্যেক ক্ষেত্রের প্রত্যেক শ্রেণীর মধ্যেই এই দুস্থ শ্রেণী আজ দেখা দিয়াছে। ইহারা পেশাদার ভিক্ষুক নয়, মাত্র দুই বৎসর আগে ইহারা সমাজের দশ জনের একজন ছিল, আর দশ জনের মত ইহাদেরও সংসার ছিল, পরিবার ছিল, বাড়ি ছিল; কাজ ছিল। দুর্ভিক্ষ আরম্ভ হইলে তাহারা প্রথমে সঞ্চিত সম্বল খরচ

করিয়াছে, তাহার পর কর্জ করিয়া চালাইয়াছে। কর্জ যখন আর মেলে না তখন স্থাবর অস্থাবর বেচিয়া দিয়াছে, তাহার পর নিঃস্ব হইয়া লঙ্গরখানার সন্ধানে বাহির হইয়াছে। এই ভাবে যখন বাহির হইয়াছে তখন তাহাদের মধ্যে স্ত্রীপুত্র-সম্বন্ধ পর্য্যন্ত নষ্ট হইয়া গিয়াছে, রহিয়াছে শুধু মাত্র নিজের পেটের জন্য প্রত্যেকের আপ্রাণ চেষ্টা। আস্তাকুঁড়েতেও মানুষে কুকুরে একসঙ্গে উচ্ছিষ্ট লইয়া কাড়াকাড়ি করিয়াছে। বিষয় সম্পত্তি, পরিবার-পরিজন, জাতিধর্ম্ম তখন এই বিপর্য্যয়ের আঘাতে তাহাদের মন হইতে একেবারে মুছিয়া গেল। মা ছেলেকে বিক্রয় করিল, স্বামী স্ত্রীকে বিক্রয় করিল।

এই বিরাট জনসঙ্ঘ যদি লুঠ করিতে আরম্ভ করিত, তাহা হইলে এক মুহূর্ত্তে সমগ্র বাংলা দেশের দশা হইত হিংস্রজন্তুসমাকুল অরণ্যের মত ; লুঠ করিবার মত ঐশ্বর্য্য যে দেশে ছিল না তাহা নয়, ঐশ্বর্য্যবানদের সম্পদ বরঞ্চ বাড়িয়াছে। কিন্তু এই দুস্থরা ছিল গ্রামের লোক, গ্রাম্য সমাজের শান্তি ও সাধুতার নীতি তাহাদের মজ্জায় মজ্জায় ছিল জড়িত। একটা প্রাচীন শক্তিশালী সভ্যতার তাহারা বংশধর ; মৃত্যুর মিছিলে দাঁড়াইয়াও সভ্যতার শেষ রেশটুকু তাহাদের মধ্যে বাঁচিয়া ছিল ; গ্রাম্য সভ্যতার অসীম সহিষ্ণুতা তাহাদিগকে লুঠতরাজের পথ হইতে ঠেকাইয়াছে।

গৃহস্থেরা ভিক্ষুক হইতেছে

সমাজে দুস্থদের পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য সঙ্ঘবদ্ধভাবে কোনো ব্যবস্থা নাই। অর্থনৈতিক সঙ্কটে প্রত্যেকেই নিজের ভাগ্য অন্বেষণ করিতেছে। কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য সবই অচল। অথচ প্রত্যেকে ভাবে, কী করিব, কিছুই করিতে পারিব না, কোনো উপায় নাই। যুদ্ধের সুযোগে যাহাদের উপর লক্ষ্মীর দৃষ্টি পড়িয়াছে তাহাদের লক্ষ্য যে-কোনো উপায়ে টাকা চাই। দেশবাসীর ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের কর্তৃত্ব এমন একটা আমলাতন্ত্রের হাতে যাহার সঙ্গে জনকল্যাণের কোনো সম্পর্ক নাই, যাহার আছে শুধু প্রভুত্ব অক্ষুন্ন রাখিবার তাগিদ। এই অবস্থায় দুস্থদের গৃহস্থ হইবার উপায় নাই, গৃহস্থরাই দুস্থ হইবে। তাই গত দুই বৎসর ধরিয়া গৃহস্থ পরিবার ভাঙিয়া গৃহহীন বন্ধনহীন যাযাবর ভিক্ষুকের সংখ্যাই বাড়িয়া চলিয়াছে। ভিক্ষুকের সংখ্যা কী ভয়াবহ ভাবে বাড়িতেছে রিলিফ-কর্ম্মিগণ কর্তৃক সংগৃহীত নিম্নলিখিত তথ্য হইতে তাহা বুঝা যাইবে :—

মহকুমার নাম	যে-কয়টি পরিবারের তদন্ত করা হইয়াছে তাহার সংখ্যা	সমস্ত পরিবারের শতকরা কতটি ভিক্ষুক		
		১৯৩৯	১৯৪৩	১৯৪৪
টাঙ্গাইল	২৬৯	·৫৫	১·১	২·২১
তমলুক	৪৭৮	৪·০০	৭·৩৩	৮·১১
ডায়মণ্ড হারবার	২৬৯	১·৭১	৩·৬৯	৬·৭৮
হুগলী	২৪৪	২·১	২·১	২·৯
নারায়ণগঞ্জ	২৩৩	২·৭১	২·৭১	৫·১৫

১৯৩৯ সালের তুলনায় তমলুক এবং নারায়ণগঞ্জে ভিখারীর সংখ্যা দ্বিগুণ হইয়াছে, টাঙ্গাইল এবং ডায়মণ্ড হারবারে ৪গুণ হইয়াছে। সবচেয়ে বেশি দুর্ভিক্ষ-পীড়িত ১৫টি মহকুমার অভিজ্ঞতা হইতে বলিতে পারি যে, এই সব অঞ্চলে গড়ে প্রতি মহকুমার শতকরা ৭টি পরিবার ভিক্ষা দ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করিতেছে। যে-দেশে স্বদেশসেবার আগ্রহ পর্য্যন্ত লোকে হারাইয়া ফেলে সেই দেশেই ইহা সম্ভব। যে-দেশের মানুষ এত দ্রুত এবং এত সংখ্যায় ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিতে বাধ্য হয়, বুঝিতে হইবে সে-দেশের স্বাভাবিক অর্থনীতি ভাঙিয়া চুরমার হইয়া যাইতেছে।

মহামারি

দুর্ভিক্ষের হাত হইতে যাহারা কোনোমতে আত্মরক্ষা করিতে পারিয়াছে তাহাদেরও মহামারির কবলে পড়িতে হইয়াছে।

বাংলা সরকারের প্রচার-বিভাগ হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, ১৯৪৪ সালে সেপ্টেম্বর মাস পর্য্যন্ত ১২ লক্ষ লোক মহামারিতে মারা গিয়াছে। অর্থাৎ ১৯৪৩ সালে দুর্ভিক্ষ যে-মৃত্যুস্রোত আনিয়াছিল, ১৯৪৪ সালে মহামারিও তাহাই আনিয়াছে। দুর্ভিক্ষ ও দুস্থতা বাঙ্গালীর জীবনীশক্তি এমন ভাবে কমাইয়াছে যে আজ যে-কোনো ব্যারামই মহামারির আকার ধারণ করে এবং যে-কোনো ব্যারামেই মৃত্যুর সংখ্যা বেশি হয়।

মহামারির প্রথম ঢেউ আসে ১৯৪৩ সালের আগষ্ট-সেপ্টেম্বর মাসে দুর্ভিক্ষের সঙ্গে

সঙ্গে। দুর্ভিক্ষপীড়িত জনসাধারণ অখাদ্য কুখাদ্য খাইতে আরম্ভ করায় কলেরা এবং আমাশয়ের প্রাদুর্ভাব দেখা দেয়। কত লোক এই সময় রোগে মারা যায় তাহার কোনো হিসাব নাই, কোনো কোনো হাসপাতাল হইতে তাহার খানিকটা আন্দাজ পাওয়া যায় মাত্র। রংপুর জেলায় ঠিক এই সময় গ্রামে গ্রামে রোগ এমন দুরন্তভাবে ছড়াইয়া পড়ে যে, কৃষক-সভার যে-সব কর্ম্মী দুর্ভিক্ষের বিরুদ্ধে জনগণের সংগ্রাম পরিচালনার জন্য গ্রামে গ্রামে ছুটিয়াছিল তাহারা রোগের আক্রমণে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে। কৃষক-সমিতির কয়েকটি শক্তিশালী কর্ম্মক্ষেত্রের স্থানীয় নেতা এবং কর্ম্মীরাও কলেরায় এবং বসন্তে মৃত্যুমুখে পতিত হন। দুর্ভিক্ষের গতি যাহারা রোধ করিবার জন্য দাঁড়াইয়াছিল, ব্যাধিকে তাহারা রোধ করিতে পারে নাই। ফরিদপুর, চট্টগ্রাম, উত্তর বাখরগঞ্জ প্রভৃতি যে-যে অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ প্রবল আকার ধারণ করিয়াছিল, সেই সেই অঞ্চলেই ব্যাধির প্রকোপ হয় রংপুরের মত।

মহামারির দ্বিতীয় ঢেউ আসে ১৯৪৩ সালের ডিসেম্বর মাসে। এই ঢেউ ১৯৪৪ সালের ফেব্রুয়ারি পর্য্যন্ত প্রবলভাবে বজায় ছিল। এবারকার প্রধান ব্যাধি হইল ম্যালেরিয়া এবং বসন্ত। ম্যালেরিয়া এবার এমন ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করে যে, মৃত্যুর মাত্রা অন্যান্য বছরের হিসাব ছাড়াইয়া যায়। ১৯৪৪ সালের প্রথম ৪ মাসে ম্যালেরিয়ায় মারা যায় বাংলার ২ লাখ লোক। এই বিবরণ হইল বাংলা সরকারের স্বাস্থ্য-বিভাগ কর্ত্তৃক সংগৃহীত। উত্তর এবং পূর্ব্ব বঙ্গের ৭টি জেলায় বসন্ত মহামারির আকার ধারণ করিয়াছিল এবং ১৯৪৪ সালের প্রথম তিন মাসে উক্ত ৭টি জেলায় বসন্ত রোগে ৪৫০০০ লোক মারা যায়। ১৯৪৩ সালে এই সময় ঐ অঞ্চলে বসন্ত রোগে মারা গিয়াছিল মাত্র ১০০০ লোক। রংপুর জেলায় এই সময় হাট-বাজার ও সভা-সমিতি পর্য্যন্ত বসন্ত রোগের প্রাদুর্ভাবে চালানো অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছিল, ক্ষুধার্ত্ত দুস্থের মত বসন্ত-রোগীকেও রাস্তায় ঘাটে চলাফেরা করিতে দেখা যাইত।

ইহার পর এপ্রিল হইতে জুন মাস পর্য্যন্ত মহামারির বেগ কিছুটা কম ছিল। কিন্তু জুলাই মাসে বর্ষা শুরু হইতে-না-হইতেই দেখা দিল মহামারির তৃতীয় ঢেউ। এবার দেখা দিল ম্যালেরিয়া। বাংলার প্রায় প্রত্যেক জেলাই এই সময় ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়। সেপ্টেম্বর মাসে ম্যালেরিয়ার এপিডেমিক যখন

সব চেয়ে বেশি. তখন বাংলার প্রায় অর্দ্ধেক লোক ম্যালেরিয়ায় ভুগিতেছিল। কলিকাতাতে বেলেঘাটা ও নারকেলডাঙ্গা অঞ্চলে তখন ঘরে ঘরে ম্যালেরিয়া লাগিয়াছে। রিলিফ-কর্ম্মীরা এই সময় মফঃস্বলের কয়েকটি অঞ্চলের তথ্য সংগ্রহ করিয়া নিম্নলিখিত বিবরণ পাইয়াছেন :—

মহকুমার নাম	জনসখ্যার শতকরা কত অংশ রোগাক্রান্ত
টাঙ্গাইল (ময়মনসিংহ জেলা)	৪৭
তমলুক (মেদিনীপুর জেলা)	৩৩
হুগলী	৮
মেহেরপুর (নদীয়া জেলা)	৯
নারায়ণগঞ্জ (ঢাকা জেলা)	১৫

রোগের প্রাবল্য এত হইলে শুধু মানুষ মরে না, কৃষি-শিল্পও ভাঙে, সমাজের ভিতর দুস্থতাও বাড়ে। বহু উপার্জ্জনক্ষম ব্যক্তি বার বার রোগে ভুগিয়া অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে। অনেক জায়গায় এই রকম ভাবে উপার্জ্জনক্ষম ব্যক্তিদের শতকরা ১০ জন অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ায় তাহাদের পোষ্যেরা দুস্থের দল বাড়াইয়াছে। ১৯৪৩ সালে অনাহার এবং ১৯৪৪ সালে রোগ বহু পরিবারকে ভিখারী করিয়াছে, বহু গ্রামকে জনশূন্য করিয়াছে।
মহামারির ৪র্থ ঢেউ আসিয়াছে ১৯৪৫ সালের মার্চ মাসে। এবারকার প্রকোপ কলেরা এবং বসন্তের।

বন্যাস্রোতের মত মৃত্যু আসিয়া গ্রামের পর গ্রাম গ্রাস করিতেছে, নারী ও শিশুদের অসহায় অবস্থায় দুস্থতার পঙ্কে টানিয়া নামাইতেছে। কত হাজার লোক যে একেবারে চিরকালের জন্য অকর্ম্মণ্য হইয়া গিয়াছে তাহার কোনো হিসাব নাই। অধ্যাপক প্রশান্ত মহলানবিস এবং ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় দুর্ভিক্ষের ফলাফল সম্পর্কে ব্যাপকভাবে তথ্য সংগ্রহ করিতেছেন, সে-তথ্য যে-দিন প্রকাশিত হইবে সেই দিন দুনিয়ার লোক একটি প্রাচীন ও মহান জাতির চরম দুর্দ্দশার কথা জানিতে পারিবে।

বাংলার গ্রামগুলিতে জন্মের হার কমিতেছে, মৃত্যুর হার জন্মের চেয়ে বাড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। বিভিন্ন ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের নিকট জন্মমৃত্যুর যে-হিসাব থাকে তাহা হইতে দুইটি জেলার বিবরণ দিলাম :—

চট্টগ্রাম জেলা (হাজার করা কত জন)			কুষ্টিয়া থানার ১৫টি ইউনিয়ন (কুষ্টিয়া শহর মিউনিসিপ্যাল এলেকা বাদ) (মোট কত জন)	
সাল	জন্ম	মৃত্যু	জন্ম	মৃত্যু
১৯৪২	২২.১	২১.০৭	২৮২৬	৩২৮৫
১৯৪৩	১৫.১	৪৭.০৫	২৩৮১	৪৫০৩
১৯৪৪	১৩.৯২	২৮.৬	১২৮৪	২৭৭৮

এই তথ্যকে দুর্ভিক্ষপীড়িত দুস্থ এলেকার ছবি বলিয়া ধরা যায়। বাঙ্গালীর বংশ কি এই ভাবে লোপ পাইবে? একেবারে লোপ হয়তো পাইবে না; বাঁচিবার ইচ্ছা মানুষের প্রবল, তাই দুস্থ ও রোগীরা যে-কোনো রকমে বাঁচিবার চেষ্টা করিবে। সমাজের ভিতর তাহাদের বাঁচিবার ব্যবস্থা যদি না হয়, তবে তাহারা সমাজের বাহিরে যাইয়া বাঁচিবে। অক্ষম অশক্ত ও পঙ্গুদের উদরপূর্ত্তির কামনা ছাড়া আর কোনো লক্ষ্য থাকিবে না; কেহ বা হইবে ধনীর ক্রীতদাস, কেহ বা হইবে দুর্জন।

রোগের এত প্রাদুর্ভাব, অথচ বাংলার ধনীর মধ্যে অকুণ্ঠিত দানের মনোভাব নাই। যুদ্ধের টাকায় এবং দুর্ভিক্ষের সময় মজুত করিয়া চোরাকারবারের টাকায় বড়লোক হইয়াছে এমন লোকের সংখ্যা দেশে কম নয় কিন্তু তাঁহাদের দেশভক্তি শুকাইয়া গিয়াছে। ১৯৪৫ সালের ৬ই জুন ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় বেঙ্গল মেডিকেল রিলিফ কোঅর্ডিনেশন কমিটির সাহায্যের জন্য আহূত এক সাংবাদিক-বৈঠকে বলেন— "বাহির হইতে আমি যে-পরিমাণ সাহায্য পাইতেছি, বাংলা হইতে তাহা আমি পাই নাই। ইহা সত্য যে, বাংলার জনসাধারণের সাহায্য দান করার শক্তি গত দুর্ভিক্ষে অনেকটা কমিয়া গিয়াছে, কিন্তু এই সময়ে আবার অনেকে বড়লোকও হইয়াছেন। তাঁহারা আজ সাহায্য করিতে আগাইয়া আসিতেছেন না কেন? সুতরাং

সাংবাদিকদের কাছে আমার অনুরোধ এই যে, তাঁহারা যেন নিজেদের কাগজ মারফত এই সম্পর্কে আন্দোলন চালান। আমার দৃঢ় ধারণা আছে, আন্দোলন ও প্রচার চলিলে বাংলা দেশ হইতে প্রচুর সাহায্য পাওয়া যাইবে।

—'জনযুদ্ধ', ১৪ই জুন ১৯৪৪

ঔষধের চোরাকারবার

রোগের প্রাবল্য যখন বেশি, তখন অন্যান্য জিনিসের মত ঔষধও অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। ম্যালেরিয়ার একমাত্র ঔষধ কুইনাইন। গত বৎসর ম্যালেরিয়ার আক্রমণ যখন সবচেয়ে প্রবল, তখন দেখা গেল বাজারে কোথাও কুইনাইন পাওয়া যায় না। গ্রাম-অঞ্চলে চোরাবাজারে প্রতি পাউণ্ড কুইনাইন ৯০০ টাকা পর্যন্ত বিক্রয় হইয়াছে। কুইনাইনের কণ্ট্রোল-দর প্রতি পাউণ্ড ৩৭৷৷০ টাকা। কলিকাতায় সে-সময় কুইনাইনের বাজার-দর ছিল প্রতি পাউণ্ড ৪০০ টাকা। এখনও কলিকাতার বাজারে ২০০ টাকার কমে এক পাউণ্ড কুইনাইন পাওয়া যায় না। ঔষধ তৈয়ার করিবার জন্য যে-সমস্ত রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করা হয় তাহা বড় বড় বিলাতি কোম্পানির একচেটিয়া; সেই সমস্ত দ্রব্যই বাজারে কণ্ট্রোল-দরের অনেক বেশি দরে বিক্রয় হয়, সচরাচর পাওয়াই যায় না। নিচে কতকগুলি রাসায়নিক দ্রব্যের কণ্ট্রোল-দর আর চোরাবাজারের দরের তুলনা দেওয়া গেল :—

দ্রব্যের নাম	কণ্ট্রোল-দর	বাজার-দর
সোডি বাইকার্ব	প্রতি হন্দর ১৫৲	প্রতি হন্দর ৬০৲
বোরিক এসিড্	প্রতি পাউণ্ড ৸/০	প্রতি পাউণ্ড ৫৷৷০
কার্বলিক এসিড্	„ ১৸৴০	„ ২৫৲

১৯৪৪ সালের মাঝামাঝি বাজার-দর চড়িয়াছিল, সম্প্রতি দর কিছু কমিয়াছে। ঔষধের যখন এত দর তখন গরীবের পক্ষে ডাক্তার দেখানো কিংবা ঔষধ খাওয়া অসম্ভব; এই অরাজকতার অবস্থায় মৃত্যু ছাড়া তাহাদের আর গতি ছিল না। গরীব ডাক্তারদের পক্ষে ঔষধ সরবরাহ করা মুশ্‌কিল। এই অবস্থায় ঔষধের ভিতর ভেজাল চলিতেছে বিস্তর। একদিকে রোগের প্রাদুর্ভাব, অন্যদিকে ঔষধের অভাব দেশে ভীষণ আতঙ্ক সৃষ্টি করে।

১৯৪৪ সালের আগষ্ট মাসে কলিকাতায় ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল এসোসিয়েশন হলে

ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের নেতৃত্বে ডাক্তার, মেডিক্যাল ছাত্র এবং ঔষধ-বিক্রেতাদের এক সম্মেলন হয়। এই সম্মেলনে নিম্নলিখিত প্রস্তাব গৃহীত হয়:—"এই সম্মেলনের অভিমত এই যে, যদি বে-সরকারি সংগঠনের মারফত যথেষ্ট পরিমাণ ঔষধ প্রভৃতি সরবরাহের ব্যবস্থা না হয়, তাহা হইলে এই সব জিনিসের চোরাকারবার বন্ধ হইবে না। এই সম্মেলন ঔষধ প্রস্তুতকারক এবং বিক্রেতাদের অনুরোধ করিতেছে যে তাঁহারা যেন লক্ষ লক্ষ জনগণের জীবন বাঁচাইবার জন্য ঔষধের চোরাকারবার চালাইতে নিরস্ত থাকেন।"

চোরাবাজারের আধিপত্য

বাংলার পল্লীগ্রামে এত অভাব কেন? জীবনধারণের উপযুক্ত প্রত্যেক জিনিসেরই এত দর কেন? ব্যবসায়ীরা বলে, দেশে জিনিসের যথেষ্ট সরবরাহ নাই, আমদানি না থাকিলেই দর বাড়ে। সত্য কথা। কিন্তু সাধুতা বলিয়া একটা কথা আছে। জিনিস আটকাইয়া রাখিয়া যথেচ্ছ দর বাড়ানো, এত বাড়ানো যাহাতে দেশের অধিকাংশ লোক সে-জিনিস কিনিতে পারে না, কেবল ধনীরাই পারে, ইহাকে সাধুতা বলে না। উৎপাদনকারীর খরচ পোষায় ও স্বাভাবিক মুনাফা পাওয়া যায় এমন দরে জিনিস বিক্রয় করাই সাধু ব্যবসায়। অভাবের সময় সে-দর ইচ্ছামত বাড়ানো যায় বলিয়াই বাড়াইব, তাহাতে দেশের লোক মরে মরুক—ইহাকে বলে বন্য নীতি, ইহাকে সামাজিক নীতি বলে না। যুদ্ধসঙ্কটে বন্য নীতিই হইয়াছে উৎপাদনকারী ও ব্যাপারীদের নীতি।

দর কণ্ট্রোল এই জন্যই করা হয় যাহাতে কাহাকেও ক্ষমতার অতিরিক্ত দর না দিতে হয়, অথচ উৎপাদনকারী তাহার ন্যায্য দর পায়। যখন যে-জিনিসের দর কণ্ট্রোল করা হয়, ব্যাপারীরা তখনই সেই জিনিস বাজার হইতে সরাইয়া ফেলে; যাহাতে কণ্ট্রোল দরের বেশি দরেও লোকে কেনে তাহাই তাহাদের উদ্দেশ্য। গভর্নমেণ্ট অনেক জিনিসের দর কণ্ট্রোল করিয়াছে, কিন্তু মাল সরবরাহের ব্যবস্থা করে নাই, ব্যাপারীরা ইচ্ছা করিলেই মাল লুকাইয়া কণ্ট্রোল-দরে জিনিস বেচিতে অস্বীকার করিতে পারে। এই ভাবেই চোরাবাজারের উৎপত্তি।

কারখানার মালিক এবং ব্যাপারীদের চিন্তা কেমন করিয়া তাহারা আরও টাকা করিবে। তাই তাহারা বেপরোয়া ভাবে চোরাকারবার চালায় এবং তাহার

জন্য একটুও অনুতপ্ত নয়। টাকার লোভ ছাড়া তাহাদের আর কোনো ধর্ম নাই, মানুষের দুরবস্থা তাহাদের ঐশ্বর্য্য বাড়াইবার সুযোগ। ধনীর টাকা আছে, যে-কোনো দরে তিনি জিনিস কিনিতে পারেন। তিনি কী করিয়া জিনিস পাইবেন ইহা তাঁহার চিন্তা, সমাজ বাঁচুক কিংবা মরুক সে-চিন্তা তিনি করেন না; তাই চোরাবাজারকে তিনি বরদাশ্ত করেন, চোরাবাজারের সঙ্গে ভাব করিয়া তিনি তাঁহার নিজের সংসার দেখেন।

এই ভাবে বাংলার চোরাবাজারের প্রভুত্ব বাড়িয়াছে, চোরাবাজার ছাড়া বাংলায় আজ আর স্বাভাবিক বাজার নাই।

১৯৪১ সালে জাপান যখন প্রশান্ত মহাসাগরে যুদ্ধ ঘোষণা করে, তখন হইতেই যানবাহনের অভাব আরম্ভ হয়, বিদেশী জিনিসের আমদানি কমিতে থাকে। এই সময় হইতেই ব্যাপারীরা দর বাড়াইতে আরম্ভ করে। সরকার নামে মাত্র কয়েকটি জিনিসের দর বাঁধিয়া দিল, কিন্তু বাঁধা দর চালু করিবার কোন চেষ্টা করিল না। ব্যাপারীরা একটু একটু করিয়া কণ্ট্রোল-দরের বেশি দরে জিনিস বিক্রয় করিয়া হাত পাকাইতে আরম্ভ করিল।

দেশভক্তরা ব্যাপারীদের বিরুদ্ধে কোনো কথা বলিলেন না। 'কণ্ট্রোল-দর চালু করা গভর্নমেণ্টের কাজ, আমাদের কাজ নয়'—ইহাই হইল দেশভক্তের নীতি। সুতরাং ব্যাপারীদের কোনো ভয়ও ছিল না। তাহারা দেখিল, সরকার কিছু বলিবে না, কারণ তাহার গরজ নাই; দেশভক্তরা অধিকাংশই কিছু বলিবেন না, কারণ তাঁহারা চোরাকারবারীর বিরুদ্ধে সক্রিয় ভাবে কিছু করাতে গভর্নমেণ্টের সঙ্গে সহযোগিতা করা হয় বলিয়া মনে করেন।

চট্টগ্রামে ও কলিকাতায় যখন বোমা পড়িল, তখন সঙ্কট আরও ঘোরতর হইল। যানবাহন অচল, লোকের মনে আতঙ্ক, চারিদিকে অরাজকতার অবস্থা। এই সময় বড় বড় ব্যাপারীরা প্রত্যেকটি জিনিসের জন্য যে-কোনো দর হাঁকিতে আরম্ভ করিল। দর কণ্ট্রোলের কড়াকড়ি আরম্ভ হইলে তাহারা জিনিস একেবারে বাজার হইতে সরাইয়া ফেলিতে বিলম্ব করিল না। এমনিভাবে মজুত করা যে অন্যায় দেশভক্তরা তাহা লইয়া কোনো প্রচার করিলেন না। মজুতদারেরা সুর উঠাইল: কণ্ট্রোল

তুলিয়া দাও, স্বাধীন বাণিজ্য চালু কর, তাহা হইলেই দরদস্তুর স্বাভাবিক হইবে। দেশভক্তরাও অনেকে সেই সুরে সুর মিলাইতে আরম্ভ করিলেন—মজুত করিও না একথা তাঁহারা বলিলেন না।

মজুতদারদের নজর পড়িল চাউলের উপর। চাউলের উৎপাদন কম হইয়াছে, আমদানি বন্ধ, দুর্ভিক্ষ আসিতেছে, সুতরাং চাউলের কারবারেই টাকা। বড় বড় ব্যাপারীরা বাহির হইলেন মফঃস্বল হইতে চাউল কিনিয়া মজুত করিতে। লক্ষ লক্ষ লোক যখন পথে পথে মরিতে লাগিল, সমাজের ভাঙন আরম্ভ হইল, তখন চাউল যে দেশে একেবারে ছিল না তাহা নয়। অবস্থাপন্ন মধ্যবিত্ত ঘরের লোক না খাইয়া মারা যান নাই, চাউল তাঁহারা পাইয়াছেন, ৫০৲ দিলে এক মণ চাউল পাওয়া যাইত। গভর্নমেণ্ট বিদেশ হইতে চাউল আনাইবার ব্যবস্থা করে নাই, দেশের অবস্থাপন্ন দশ জনও সমান ভাগ করিয়া খাইবার নীতি গ্রহণ করে নাই, গরীবেরা তাই মারা গিয়াছে, তাহাদের সংসার ভাঙিয়াছে।

১৯৪৩ সালের শেষ দিকে রেশনিং চালু করার প্রস্তাব উঠিল। তখন ব্যাপারীরা নূতন সুর তুলিল। তাহারা বলিল: রেশনিং চাই না, ভালোভাবে দর কণ্ট্রোল কর।

১৯৪৩ সালের পর চাউল লইয়া ছিনিমিনি খেলা আর সম্ভব হয় নাই। কলিকাতায় রেশনিং, উৎপাদনের বাড়তি এবং সরকারি বিক্রয়ের ফলে চাউল মজুত করা কষ্টকর হইয়া উঠিয়াছে। এই বৎসর চাউলের অভাব নাই, কিন্তু কাপড়ের অভাব আছে; সুতরাং চাউলের ব্যাপারীরা ১৯৪৩ সালে যাহা করিয়াছিল কাপড়ের ব্যাপারীরা এবার তাহা করিয়াছে। দেশময় যখন কাপড়ের অভাবে স্ত্রীলোকের লজ্জা নিবারণ করা অসম্ভব হইয়া উঠে, তখন ব্যাপারীরা বলে কাপড় নাই। অথচ কলিকাতাতে ২৫শে মার্চ ৩০০০ দোকানে খানাতল্লাসি করিয়া প্রায় ২০০০০ গাঁইট কাপড় পাওয়া যায়। ইহা ছাড়াও বাংলার নানাস্থানে ব্যাপারীদের নিকট হইতে প্রচুর কাপড় ধরা পড়িয়াছে।

কোনও সূত্রে খবর পাইয়া পুলিস বড়বাজারের এক ব্যবসায়ীর নিকট হইতে ৭৮ গাঁইট কাপড় উদ্ধার করে। উহার মূল্য ১৷৷ লক্ষ টাকা হইবে।

—আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৫।১।৪৫

এন্‌ফোর্সমেন্ট বিভাগের পুলিস কলিকাতার লোহিয়া নর্ম্মল লেনের এক ব্যবসায়ীর নিকট হইতে ৫০,০০০ টাকা মূল্যের ধুতি ও শাড়ি উদ্ধার করে।

—ষ্টেটসম্যান, ১১।২।৪৫

বরিশাল জিলার ঝালকাটির এক মারওয়াড়ী ব্যবসায়ীর নিকট হইতে পুলিস ২৫০০০ টাকা মূল্যের কাপড় উদ্ধার করিয়াছে। প্রকাশ, ব্যবসায়ীর ঐ কাপড় পায়খানায় লুকানো ছিল।

—হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড, ৬।৩।৪৫

এন্‌ফোর্সমেন্ট বিভাগের পুলিস মধ্য কলিকাতার জনৈক ব্যবসায়ীর গুপ্ত গুদাম হইতে ১০০০০ টাকা মূল্যের ৪ গাঁইট কাপড় উদ্ধার করিয়াছে।

—ন্যাশনালিষ্ট, ৭।৩।৪৫

এই ধরনের খবর সংবাদপত্রে রোজই বাহির হইতেছে, অথচ এই সব ব্যাপারীরা প্রত্যেক জায়গাতেই বলে কাপড় নাই।

মজুতদার এমন এক নূতন জাত যে সহস্র সহস্র নরনারীর ভাত-কাপড়ের অভাবে অবিচলিত থাকিতে পারে শুধু টাকার লোভে। তাহাদের লোভের বিষ সমাজকে জর্জ্জর করিয়া তুলিয়াছে।

যুদ্ধের বাজারে যাহারা ধনী হইয়াছে তাহাদের নীতি হইল আরও ধনী হওয়া। আজ ধনী হইবার প্রধান উপায় মাল মজুত করিয়া চড়া দরে বিক্রয় করা।

কাপড়, তেল, নুন, চিনি, ঔষধ প্রত্যেক জিনিসই চোরাকারবারীর হাতে। যেখানে খাদ্য-কমিটি গঠন করিয়া জিনিস বিতরণের ব্যবস্থা হয়, সেখানে খাদ্য-কমিটির ভিতর ঢোকে চোরাকারবারী। বাংলার বহু খাদ্য-কমিটি চোরাকারবারীরা দখল করিয়া লইয়াছে। যেখানে সরবরাহের জন্য সরকারি ডিলার নিযুক্ত হয়, সেখানেও চোরাকারবারী আসিয়া ডিলারের পদ গ্রহণ করে। **প্রত্যেক গ্রামে ও শহরে এই ভাবে নূতন এক শ্রেণী ধনীর উদ্ভব হইয়াছে; জমিদার, জোতদার, ব্যবসাদার, যুদ্ধের কণ্ট্রাক্টর প্রভৃতি নানা শ্রেণী হইতে লোক আসিয়া এই শ্রেণী গঠন করিয়াছে। প্রত্যেক শ্রেণীর মধ্যে যাহারা নিকৃষ্ট প্রকৃতির মানুষ তাহারাই হইয়াছে মজুতদার। সমাজের সর্ব্বত্রই আজ তাহাদের দুর্নীতির প্রভাব।**

সমাজের ভিতর মজুতদার নূতন ধরনের ভেদ সৃষ্টি করিয়াছে। শহর এবং গ্রামের যোগসূত্র ছিল এতদিন স্বাধীন বাণিজ্য। শহরের জিনিস গ্রামে আসিত, গ্রামের জিনিস শহরে যাইত। বাণিজ্যের মারফত শহরের লোক কৃষিজাত পণ্য পাইত, গ্রামের লোক পাইত কারখানার জিনিস। মফস্বল অঞ্চলের গঞ্জ ও বন্দরগুলি ছিল শহর ও গ্রামের ভিতরকার সেতু। কৃষকেরা গঞ্জে আসিয়া তাহাদের ফসলের মূল্য সংগ্রহ করিত, আর শহরের তৈরি জিনিস এখানে কিনিতে পাইত। শহর হইতে শিক্ষা ও সভ্যতা এই আদান-প্রদানের ভিতর দিয়াই এত দিন গ্রামে গিয়াছে। দেশাত্মবোধ উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক ভাবধারার যোগাযোগও শহর ও গ্রামকে একসঙ্গে বাঁধিয়াছে। কিন্তু আজ পল্লীতে পল্লীতে যখন ধ্বংসের করুণ দৃশ্য, তখন গঞ্জ ও বন্দরগুলি হইয়াছে অতিরিক্ত মুনাফাখোরিতে ওস্তাদ মজুতদারের ঘাঁটি—চাউল, চিনি, নুন, কাপড় প্রভৃতি আটকাইয়া রাখিবার জায়গা। শহরের জিনিস আজ গ্রামে যায় না, গ্রামের জিনিস শহরে আসে না, সব জিনিসই যায় চোরাবাজারে, আর সেখান হইতে দুর্নীতি ছড়ায় শহর পল্লী সমস্ত জায়গায়। শহর, গঞ্জ, পল্লী সবই আজ ছাড়াছাড়ি হইয়া গিয়াছে। এক দিকে চোরাকারবারী, আর-এক দিকে সমগ্র জনসাধারণ—ইহাই হইল বর্তমান বাংলার শ্রেণীবিভাগ।

দেশের উৎপাদন কিংবা বণ্টন কোনো ব্যাপারেই দেশাত্মবোধের স্থান নাই। যুদ্ধের অস্বাভাবিক চাহিদা এবং যুদ্ধের অস্বাভাবিক অবস্থা যখন দেশের অর্থ-নীতির উপর জোর চাপ দিল, তখন যদি দেশে এমন একটা গভর্নমেণ্ট থাকিত যাহার উপর জনগণের আস্থা আছে, যে জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকারকে সম্মান করে, যে জনগণের দেশাত্মবোধ জাগাইয়া তুলিয়া যুদ্ধ, উৎপাদন, বণ্টন সমস্ত কাজই চালায়, তাহা হইলে যুদ্ধের চাপে সমাজ এমন ভাবে ভাঙিয়া পড়িত না; কিন্তু এদেশের জনস্বার্থবিরোধী আমলাতন্ত্র সে-কাজ করে নাই বা করিতে চাহে নাই। তাই তাহার ব্যবস্থার ভিতর জনস্বার্থবিরোধী স্বার্থই মাথা চাড়া দিয়া উঠিয়াছে, সমাজের স্বার্থ লাঞ্ছিত হইয়াছে, আর, যাহারা শুধু যেমন করিয়া হউক টাকা চায় তাহারাই উৎপাদন এবং বণ্টনের কর্তৃত্ব হাতে পাইয়াছে। দুর্ভিক্ষের সময়

গভর্ণমেণ্ট চাউল এবং কাপড় ক্রয়-বিক্রয়ের ভার দেশভক্ত কর্ম্মীদের উপর দেয় নাই, দিয়াছে মুনাফাখোর ব্যাপারীদের উপর যাহাদের কাছে দেশভক্তির চেয়ে টাকার কদর বেশি।

তাই আজ দুস্থের জীবন বাঁচানো তো দূরের কথা, সমাজে যাহারা আজও প্রতিষ্ঠিত আছে তাহারাও দুস্থতা ও মৃত্যুর পথে ছুটিয়াছে; ভাঙা সমাজ গড়া তো পরের কথা, আপাতত সমাজ শুধু ভাঙিতেছে, চোরাবাজারের হাতেই আজ সকলে ভাগ্য।

আমলাতন্ত্রের দুর্নীতি

আমলাতন্ত্রের দুর্নীতিই চোরাকারবারীর প্রধান আশ্রয়। আমলাতন্ত্র দুর্নীতি-গ্রস্ত না হইলে মজুতদার এত প্রভাবশালী হইতে পারে না। ঘুষখোর আমলাদের কৃপায় তাহারা নির্ব্বিঘ্নে দরিদ্রের অশ্রুজল মন্থন করিয়া নিজেদের ঐশ্বর্য্য গড়িয়া তুলিতেছে। ৩১শে জানুয়ারি 'ষ্টেট্‌সম্যান' এক খবর দেয় যে, কলিকাতায় ৫০ লাখ টাকার ঘুষ এবং প্রতারণার এক মামলা সম্পর্কে তদন্ত চলিতেছে। ইহার মধ্যে অনেক সরকারি কর্ম্মচারী এবং কণ্ট্রাক্টর জড়িত আছে। এই উপলক্ষে প্রকাশ পায় যে, সরবরাহ-বিভাগের একজন কর্ম্মচারী ২০০০৲ টাকা ঘুষের দায়ে ধৃত হইয়াছে। এই ব্যক্তিরা কাহারা সাধারণে তাহা জানে না, কারণ আজও তাহাদের নাম প্রকাশ করা হয় নাই। কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের স্পেশাল ডিপার্টমেণ্ট বিভিন্ন প্রদেশে ইদানীং ৬৬৭টি ঘুষের মামলা তদন্ত করিয়াছে, তাহার ভিতর ২৭১টির মামলা রুজু করিয়াছে। এই ব্যাপারে ৮২ জন বড় বড় কমিশনপ্রাপ্ত এবং গেজেটেড অফিসার জড়িত আছেন। ধরা পড়ে নাই এমন মামলা অসংখ্য রহিয়াছে। কোনো-না-কোনো সরকারি কর্ম্মচারীকে ঘুষ না দিয়া চোরাকারবার চালানো যায় না। ঘুষ এমন সহজ হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে সাধু ব্যবসায়ী ঘুষ না দিয়া ব্যবসায় করিতে পারে না। ঘুষের মাত্রাটা কী রকম তাহার একটা নমুনা দিতেছি। ২৪শে জানুয়ারি (১৯৪৫) তারিখের 'ষ্টেট্‌সম্যান'-এ একটি চিঠি প্রকাশিত হয়। পত্রলেখক উহাতে লেখেন যে দেশের লোক বছরে নানা কারণে যত ঘুষ দেয় তাহার পরিমাণ ৬০ কোটি টাকা। যুদ্ধের আগে সারা ভারতের সৈন্যবিভাগে বছরে এত টাকা খরচ হইত না। যুদ্ধের আগে বাংলা সরকারের রেভিনিউ ছিল ইহার ৫ ভাগের এক ভাগ। ভদ্রলোকটি ৬০ কোটি টাকার এই হিসাব কী করিয়া পাইয়াছেন জানি না, তবে

ঘুষ যে-রকম ব্যাপক তাহাতে ৬০ কোটি টাকা হওয়া অসম্ভব কিছু নয়। সরবরাহ-বিভাগ, কাপড়ের দোকান, রেলষ্টেশন, ইউনিয়ান বোর্ডের আপিস, থানা সর্ব্বত্রই আছে ঘুষের আড্ডা। বড় বড় সরকারি কর্ম্মচারী হইতে ছোটখাট কর্ম্মচারী পর্য্যন্ত ঘুষ খাইলে চোরাকারবার তো চলিবেই। চোরাকারবারী ও দুর্নীতিগ্রস্ত আমলাদের পক্ষে ঘুষ নেওয়া এবং দেওয়া নিত্য প্রয়োজনীয় কাজ।

সরকারি কর্ম্মচারীদের দুর্নীতি সম্পর্কে তদন্ত করিয়া রৌলণ্ড কমিশন বলিয়াছেন—"দুর্নীতি এত ব্যাপক এবং এই দুর্নীতি দমন করা সম্পর্কে হতাশা এত প্রবল যে কঠোর হস্তে ইহা দমন না করিলেই নয়। সরকারি কর্ম্মচারীরা এবং জনসাধারণ ইহা দ্বারা কলুষিত হইতেছে। কঠোর হস্তে ইহা দমন করিতে না পারিলে গরীব জনসাধারণের প্রতি অবিচার হইবে। ঘুষের সমস্ত বোঝা গরীবদের ঘাড়েই চাপে, দুর্নীতিপরায়ণ অসৎ লোকেরাই সমৃদ্ধিশালী হয়।"

চোরাকারবারী মজুতদার সরকারি কর্ম্মচারীদের মধ্যে প্রতিপত্তি কায়েম করিয়াছে। সমাজের ভিতর সে-ই এখন সর্দার হইয়া উঠিতেছে। গ্রাম্য দেশে সে-ই গরীব জনসাধারণের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করে, তাহার নীতিই আজ সমাজের সর্ব্বসাধারণের ভিতর ছড়াইয়া পড়িতেছে। **কণ্ট্রোল ফাঁকি দিয়া দর চড়ানো, লাইসেন্স না লইয়া জিনিস বিক্রয় করা এবং অন্যের অভাব জানিয়াও অনেক জিনিস মজুত করিয়া রাখা—এই সব কাজ দুর্নীতির কাজ বলিয়া মনে করে খুব কম লোকে। অভাব-অনটনের সময় দশজনে মিলিয়া একজনকে সাহায্য করিবার নীতি আজ খুব বিরল।**

সামাজিক দুর্নীতি

দুর্নীতি সমাজের মর্ম্মস্থলে আঘাত আরম্ভ করিয়াছে।

চট্টগ্রামের জেলে, ডোম প্রভৃতি ঘরের মেয়ে দুর্ভিক্ষের সময় দলে দলে জীবন ধারণের আর কোনো পথ না পাইয়া মিলিটারির লেবর-কোরে যোগ দিয়াছিল। সেখান হইতে বহু মেয়ে সিফিলিস এবং গনোরিয়া রোগে অকর্ম্মণ্য হইয়া ফিরিয়াছে। ইহা শুধু চট্টগ্রামের কথা নয়; বাংলার দুর্ভিক্ষপীড়িত অঞ্চলে বহু ক্ষেত্রে স্ত্রী জাতির অসম্মান ঘটিয়াছে। মিলিটারির নিকট মেয়ে বিক্রয় করা এক শ্রেণীর কণ্ট্রাক্টরদের নিয়মিত পেশা। চট্টগ্রামে, কুমিল্লায়, নোয়াখালিতে এমন অনেক জায়গা আছে

যেখানে মেয়েরা দলে দলে আত্মবিক্রয় করে, আর, ছোট ছেলেরা মিলিটারিকে তাহাদের সন্ধান দিবার জন্য দালালের কাজ করে। চুরি, ঘুষ আর পরের সর্ব্বনাশ বরদাশ্‌ত করিতে করিতে আমরা এমন অবস্থায় আসিয়া পড়িয়াছি যে এই বর্ব্বরতাকেও সহ্য করি। ওরা যে তারিখের 'জনযুদ্ধে' কল্পনা দত্ত 'আরাকান রোডের ধারে নারীত্ব ও সভ্যতার অপমৃত্যু' সম্পর্কে যে-কয়টি তথ্য দিয়াছেন তাহার একটি এখানে উদ্ধৃত করিতেছি। এই তথ্য হইতে বাংলার এক দুর্ভিক্ষবিধ্বস্ত গ্রামের সম্পূর্ণ ছবি পাওয়া যাইবে :—

"আমিরাবাদের ২০।২১ বছর বয়সের আরেকটি মেয়ে মাজাদা এমনি করে মাথা উঁচু করে বাঁচতে চেয়েছিল। গরীব চাষীর ঘরের বউ সে। স্বামী তার দুর্ভিক্ষের সময় সংসার ফেলে পালিয়ে গিয়েছিল ফেনিতে। ফিরে যখন এল, তখন বাতে জ্বরে সে একেবারে পঙ্গু। লঙ্গরখানা ওআর্ক হাউস উঠে গিয়ে বেঁচে থাকার সমস্ত পথই যখন বন্ধ হ'ল, তখন শেষ পর্য্যন্ত মাজাদা বাধ্য হয়ে রাস্তার লেবার কোরের কাজ নিল। কিন্তু সেখানে গিয়ে মাজাদা বুঝল, মজুরি নিতে হবে ইজ্জতের বদলে। মাজদা নিজে তো কাজ ছাড়লই, আরও ১০।১৫ জনকে সেই দুষিত আবহাওয়া থেকে মুক্ত ক'রে আনল। তারা সকলে প্রতিজ্ঞা করল, কেউ আর লেবর-কোরে জান থাকতে যাবে না।

"তিন মাস পরে কয়েক দিন আগে আবার আমিরাবাদে গিয়েছিলাম। মাজাদার সঙ্গে দেখা হ'ল। সে তখন মৃত্যুশয্যায়। ছেলেটা আগেই মরেছে। মাজাদা ম্লান মুখে বলল, প্রতিজ্ঞা সে রাখতে পারে নি। পেটের দায়ে লেবর-কোরে না গিয়ে সে পারেনি।

"আরাকান রোডে দাঁড়িয়ে মনে হ'ল, একটা বিরাট প্রাচীন সভ্যতার ধ্বংসস্তূপে যেন দাঁড়িয়ে আছি। তার নিচে স্নেহ মমতা শ্রদ্ধা প্রীতি সমস্ত কিছু যেন গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে আছে, এই ধ্বংসের বিরুদ্ধে মাজাদা আর সরলার মত মেয়েরা ক্ষীণ হাত তুলেছিল, কিন্তু সমাজের লক্ষ লক্ষ লোকের উপেক্ষায় অবিশ্বাসে আর ধিকারে সে-প্রতিরোধ যেন গুঁড়িয়ে গেছে।"

চট্টগ্রামের এই ছবি বাংলার অনেক গ্রামেই পাওয়া যায়। স্ত্রীদাসত্বের মতই ঘৃণ্য শিশুদাসত্বের এক ছবি উদ্ঘাটিত করিয়াছেন শচীন ঘোষ। ১৫।৩।৪৫ তারিখের

'জনযুদ্ধ' পত্রিকায় বগুড়া জেলায় ক্রীতদাস-প্রথা সম্পর্কে তিনি লিখিয়াছেন—
"দুর্ভিক্ষের সময় যাহারা নিজেদের ছেলেমেয়ে বিক্রয় করিয়াছে অথবা আত্মীয়স্বজনের কাছে পোষ্য রাখিয়াছে, তাহাদের সেই সব ছেলেমেয়েদের লইয়া সমাজে এক দুর্ভাগা শ্রেণীর সৃষ্টি হইয়াছে। ইহারা মোটেই পোষ্য নয়, আসলে ইহারা আমৃত্যু ক্রীতদাস।...বালিয়াদীঘি ইউনিয়নের দুইটি গ্রামে এইরূপ ১৮ জনের সন্ধান পাইলাম। ইহাদের লইয়া পণ্যের মত কেনাবেচাও চলে।"

চুরি, ঘুষ এবং স্ত্রীলোক ও শিশু লইয়া ব্যবসায় বাংলার গ্রাম্য জীবন কলুষিত করিতেছে। এই দুর্নীতি সমস্ত সমাজের নীতির বাঁধন আলগা করিয়া দিয়াছে। শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সভ্যতা সত্য সত্যই যে বিপদাপন্ন তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় অসংখ্য দিক হইতে।

রংপুর ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার সময় একটি নকলনবিস ছাত্রকে ধরাইয়া দিবার জন্য দুর্বৃত্ত ছাত্ররা জনৈক হেড পণ্ডিতকে গুরুতর রূপে জখম করিয়া দেয়। এই দুর্বৃত্ত ছাত্রদের প্রভাব এত বেশি যে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বিশ্ববিদ্যালয়কে অনুরোধ করিয়াছেন রংপুরের পরীক্ষার কেন্দ্র বন্ধ করিয়া দিতে। এক বছর আগে রাজশাহি জেলার কর্তৃপক্ষ অনুরূপ কারণে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে অনুরোধ করিয়াছিলেন পরীক্ষা গ্রহণের দায়িত্ব হইতে তাঁহাদিগকে অব্যাহতি দিতে।

রংপুরের ঘটনার উপর মন্তব্য করিয়া 'ন্যাশনালিষ্ট' পত্রিকা (২৩।৪।৪৫) নিম্নলিখিত মন্তব্য করিয়াছেন :—

"এইরূপ ঘটনা যদি একটিমাত্র হইত, তাহা হইলে আমরা ইহার উপর কোনো মন্তব্য করিতাম না। দুর্ভাগ্যবশত এই রকম ঘটনা আরও আছে। ইহা হইতে দেখিতে পাই কী দারুণ অবনতির মধ্যে সমগ্র ছাত্রসমাজ নামিয়াছে।"

'আনন্দবাজার পত্রিকা' (২৪।৪।৪৫) এই ঘটনার উপর মন্তব্য প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন—

"সমগ্র ব্যাপারটা ছাত্রসমাজের পক্ষে কলঙ্কজনক। কিন্তু দুঃখের সহিত স্বীকার করিতে হইতেছে, ইদানীং যেন এই শ্রেণীর নিন্দনীয় আচরণের প্রাবল্য দেখা যাইতেছে। ইতিপূর্ব্বে মফঃস্বলের অন্যান্য কোনো কোনো জেলা হইতে এইরূপ সংবাদ আসিয়াছে।"

এই দুর্নীতি শুধু ছাত্রসমাজে নয়, সমগ্র সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে আজ দুর্নীতি প্রবেশ করিয়াছে। সমাজ যে ভাঙিতেছে ইহা হইতে তাহারই সাক্ষ্য পাওয়া যায়।

যে-সমাজে স্ত্রীলোক পণ্যের মত বিক্রীত হয় সে-সমাজকে সভ্য সমাজ বলে না, বলে বর্ব্বর সমাজ! "কে কার কড়ি ধারে প্রত্যেকে আপনার ডেড়া সামলাও"— দেশের ভীষণতম বিপদের দিনে এই স্বার্থপরতার নীতি আজ প্রত্যেকে অনুসরণ করিতেছে। এই নীতিই চোরাবাজারের ক্ষমতা বাড়াইয়াছে, এই নীতিই ৬০ লক্ষ বাঙ্গালীকে দুস্থ করিয়াছে, এই নীতিই দুস্থ রমণীকে বাজারের পণ্য করিয়াছে। দেশের যাহা কিছু ভালো তাহার অপমৃত্যু ঘটিতেছে। বাংলার গ্রাম্য সমাজ আজ ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত অট্টালিকার মত; দিনের পর দিন তাহার ইট একখানির পর একখানি খসিয়া পড়িতেছে

গভর্ণমেণ্ট কী করিয়াছে

দেশের এক দিকে আমলাতন্ত্র ও লোভী চোরাকারবারী সমগ্র জাতির ভাগ্য লইয়া ছিনিমিনি খেলিতেছে, জনসাধারণ তাহাদের নিকট অসহায়। অন্য দিকে লক্ষ লক্ষ দুস্থ সমাজের আশ্রয় হইতে বঞ্চিত, দেশবাসী তাহাদের জন্য কিছুই করিতে পারে না। এই দুই দৃশ্যই প্রত্যেক বাঙ্গালীকে নীতিচ্যুত করিতেছে।

দুর্নীতি ও চোরাব্যবসায় রোধ করিবার জন্য গভর্ণমেণ্টের কেতাদুরস্ত আইন এবং কর্ম্মচারী আছে। কিন্তু জনসাধারণের যথেষ্ট স্বদেশপ্রেম ছাড়া কাহারও সাধ্য নাই সমাজের যাহারা ঘাতক তাহাদের গায়ে হাত দেয়। বিশেষত, অতিলাভের লোভে দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য বড় বড় মজুতদারেরা সরকারি আমলাদের সঙ্গে এত ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত যে তাহারা সাধারণত ধরাই পড়ে না; দৈবাৎ কখনও ধরা পড়িলে তাহাদের তেমন কোনো কঠোর শাস্তি হয় না, বরং সাধারণ লোকের নিকট হইতে তাহাদের নাম গোপন করিয়া তাঁহাদের মান ইজ্জত বাঁচানো হয়।

জনসাধারণের সঙ্গে সহযোগিতা করে না বলিয়া গভর্ণমেণ্ট যেমন জনগণের শত্রুদের ধরিতে পারে না, ঠিক সেই রকম দুস্থ জনগণকে বাঁচাইতেও পারে না।

জমিতে খাল কাটিয়া নালা বাঁধিয়া গরু সরবরাহ করিয়া কৃষকদিগকে সাহায্য করিবার জন্য বাংলা গভর্ণমেণ্ট গত বছর যে-টাকা মঞ্জুর করিয়াছিল তাহার

শতকরা পাঁচ ভাগ মাত্র খরচ করিতে পারিয়াছে। তথ্য সংগ্রহ করিয়া প্ল্যান করিয়া যেখানে যত টাকা প্রয়োজন তাহা খরচ করিতে হইলে এমন কর্ম্মী চাই যাহারা দরদ দিয়া কাজ করিবে, ঠিক ভাবে যাহাতে টাকা ব্যয় হয় তাহা দেখিবে। গভর্নমেণ্ট নির্ভর করে তাহার মাইনে-করা আমলাদের উপর, তাই কিছুই করিয়া উঠিতে পারে না। দুস্থদের জীবন পুনঃসংগঠনের জন্য যে-টাকা গভর্নমেণ্ট মঞ্জুর করিয়াছে তাহা বারো ভূতে লুটিয়া খাইতেছে। এই টাকা হইতে জেলে ও মাঝিদের জন্য নৌকা তৈয়ারের কাজ আরম্ভ হইয়াছে। জেলে এবং মাঝিদের সুবিধা কবে হইবে জানি না, আপাতত কণ্ট্রাক্টরদের বাড়িতে ভোজের ব্যবস্থা হইয়াছে।

দুস্থদের কর্ম্মকেন্দ্র খুলিবার জন্য গভর্নমেণ্ট এবার মাত্র ১ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করিয়াছে। এই টাকা হইতে সম্প্রতি ১২৪টা কর্ম্মকেন্দ্র চলিতেছে। এই কর্ম্মকেন্দ্রগুলিতে ১১৭২৪ জন দুস্থ থাকে, ইহা ছাড়া বাহির হইতে ৪৯৫৭ জন আসিয়া এই কর্ম্মকেন্দ্রগুলিতে কাজ করিয়া যায়। গভর্নমেণ্টের শিশুনিবাস আছে ৬৭টি, তাহাতে ৪১১৪জন শিশু থাকে। (বাংলা সরকার কর্তৃক প্রকাশিত ১৯৪৫ সালের এপ্রিল মাসের প্রথমার্দ্ধের রিপোর্ট।) ১৯৪৩ সালে দুর্ভিক্ষ গিয়াছে, তাহার পর দুই বৎসরের মধ্যে মোট ২০৭৯৫ জনের বেশি দুস্থকে সরকারি সাহায্যে আশ্রয় দিবার ব্যবস্থা হইল না, অথচ দেশে এ-রকম প্রায় ৬০ লক্ষের জন্য সাহায্য চাই।

মহামারি দমনের জন্য সরকারি ব্যবস্থায় যে-সব হাসপাতাল খোলা হইয়াছে তাহাতে মোট ২৯৬২০ জন রোগীর জন্য সীটের বন্দোবস্ত আছে। ১০০ সীট ওয়ালা ৫২টি হাসপাতাল, ৫০ সীটওয়ালা ৯২টি হাসপাতাল এবং ৪৪১ সীটওয়ালা ২০টি হাসপাতাল চলিতেছে। মোট ২০০ সরকারি ডাক্তার গ্রামে গ্রামে চিকিৎসার কাজ করিতেছে। এই চিকিৎসা যে কত অপর্য্যাপ্ত তাহা স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে যখন দেখি যে, বাংলার গ্রাম আছে মোট ৯০,০০০ এবং মহামারির আক্রমণ যখন খুব বেশি তখন ২ কোটি লোক রোগে আক্রান্ত হইয়াছিল।

দুর্ভিক্ষের জন্য যাহারা জমি বিক্রয় করিয়াছে তাহাদের জমি ফেরত দিবার জন্য গভর্নমেণ্ট একটা আইন প্রণয়ন করিয়াছে। ২৫০ টাকা বা তাহার কম দরে যে-

সমস্ত জমি বিক্রয় হইয়াছে শুধু সেই সব জমিই এই আইনের কবলে আসিবে। জমি ফেরত পাইবার জন্য কৃষককে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট দরখাস্ত করিতে হইবে, বিচারে দাবি সাব্যস্ত হইলে কৃষক দশ বছরের কিস্তিতে দাম শোধ দিবার কড়ারে জমি ফেরত পাইতে পারিবে। এই আইনের সুবিধা কৃষকেরা কতটুকু লইতে পারিয়াছে? ১৯৪৩ সালে দুর্ভিক্ষ-পীড়িত ১৫টি এলেকায় ২৫০ টাকার বেশি দাম নয় এমন ৪,৭৩,৪৪১ দাগ জমি বিক্রয় হইয়াছে; কিন্তু ফেরতের জন্য দরখাস্ত পড়িয়াছে মার্চ মাস পর্য্যন্ত মাত্র ৭৫৭২ দাগ, তাহার ভিতর আদালত মার্চ মাস পর্য্যন্ত মীমাংসা করিয়াছে মাত্র ২৯০টি!

ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট দরখাস্ত করিয়া জমি ফেরত পাইবার সুযোগ সব কৃষক গ্রহণ করিতে পারে না, এজন্য দরকার কৃষকদের সালিশি বিচার। তাহা ছাড়া মামলা চালানোর বিশেষ কোনো নিয়মকানুন ঠিক না হইবার ফলে দায়েরকৃত মামলা ম্যাজিষ্ট্রেট শীঘ্র মীমাংসা করেন না।

দুস্থদের সাহায্য ও গ্রাম পুনর্গঠনের জন্য গভর্নমেণ্ট একটি সর্ব্বদলীয় পরামর্শদাতা কমিটি গঠন করিয়াছে,কিন্তু এখনও পর্য্যন্ত কোনো পরিকল্পনা তৈরি হয় নাই। যুদ্ধের পর দেশের অর্থনৈতিক বিকাশ কী ভাবে করা হইবে সে-জন্য ধনী বণিকরা অনেক প্ল্যান করিতেছেন, কিন্তু বাংলাতে গ্রাম সংগঠনের প্ল্যান না হইলে আর কোনো প্ল্যানই কার্য্যকরী হইবে না। গান্ধীজীর যে গঠনমূলক কার্য্যপদ্ধতি আছে তাহাতেও স্পষ্টভাবে বাংলার গ্রাম পুনর্গঠন বা দুস্থদের সামাজিক জীবনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবার কোনো ব্যবস্থা নাই। কংগ্রেস বা লীগ কেহই এখনও পর্য্যন্ত এই বিষয়ে কোনো পরিকল্পনা করিতে অগ্রসর হয় নাই। যুদ্ধে ইওরোপের বিভিন্ন দেশের সমাজ ও অর্থনীতিতে যে-ভাঙন ঘটিয়াছে, বাংলার ভাঙন তাহার চেয়ে কোনো অংশে কম নয়। বাংলার সমাজ নূতন করিয়া গড়িয়া তোলাই আজ প্রত্যেক স্বদেশভক্তের প্রাণপণ চেষ্টা হওয়া উচিত।

আমরা কী করিতে পারি

দেশকে বাঁচাইবার পথ দেশের জনসাধারণই দেখাইতেছে। চট্টগ্রাম জেলার একটা উদাহরণ দিই। কারণ, চট্টগ্রাম জেলার মানুষই দুর্ভিক্ষে সবচেয়ে জোর আঘাত পাইয়াছিল। এই জেলার ডবলমুরিং থানার অন্তর্গত কাট্টলী গ্রামে জেলে পাড়া

একেবারে ধ্বংস হইয়া গিয়াছিল। জেলে পাড়ার বাড়ি বাড়ি গিয়া দেখিয়াছি, অনাথ শিশু এবং রুগ্ন বৃদ্ধা ও বৃদ্ধ অসহায় ভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, বহু স্ত্রীলোক অনাথা হইয়া মিলিটারি লেবার-কোরে যোগ দিয়াছে। এই পাড়ার অনেক মেয়ে দুর্ব্বৃত্তদের কাছে আত্মবিক্রয় করিতে বাধ্য হইয়াছে। এই গ্রামের কাছাকাছি পাহাড়তলী শহর দুর্ব্বৃত্তদের কর্ম্মকেন্দ্র হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। দেশের লোক বহু দিন যাবত হতাশ ভাবে তাহদের চোখের সামনে সমাজের অধোগতি দেখিয়াছে আর দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়াছে। মদের দোকান আর গণিকালয়ের পৃষ্ঠপোষকদের ভয়ে কেহ তাহা বন্ধ করিতে অগ্রসর হইতে চাহে নাই। ১৯৪৪ সালের শেষ পর্য্যন্ত এই অঞ্চলে নৈরাশ্য এবং অবসাদই দেখা গিয়াছে। এই বছর কিন্তু কাট্টলির হাল আর আগের মত নাই। এই গ্রামের উৎসাহী কর্ম্মীরা সারা গ্রামের লোককে একত্র করিয়া জেলে পাড়ার ঘর বাঁধিয়া দিবার জন্য আহ্বান জানাইলেন। আন্দোলনের ফলে স্থানীয় গ্রামবাসীর নিকট হইতে টাকা উঠিল, স্থানীয় গ্রামবাসীরা উদ্যোগী হওয়ায় গভর্নমেণ্টের নিকট হইতেও টাকা পাওয়া গেল। এই ভাবে টাকা তুলিয়া কাট্টলির কর্ম্মীরা জেলে পাড়ার দুস্থদের জন্য ৪৫ খানা ঘর বাঁধিয়া দিয়াছে। এই সাফল্যে শুধু জেলেদের মনেই যে ভরসা আসিয়াছে তাহাই নয়, পাহাড়তলী ও কাট্টলির সকলেই মনে বল পাইয়াছে। তাহার পর তাহারা একত্র হইয়া পাহাড়তলীতে দুর্নীতি দমনের জন্য একটি কমিটি গঠন করিয়াছেন। প্রথমে সকলের মনে সন্দেহ ছিল, মিলিটারির যেরূপ প্রভাব তাহাতে গণিকালয় উঠানো সম্ভব হইবে কিনা। কিন্তু দ্বিধাহীন চিত্তে তাঁহারা আন্দোলন চালাইতে লাগিলেন। সেই আন্দোলনের ফলে দুর্ব্বৃত্তেরা নিজেদের জায়গা হইতে গণিকালয় উঠাইয়া দিতে বাধ্য হইয়াছে; তাহার পর তাহাদের দাবি অনুসারে স্থানীয় মদের দোকানে মিলিটারি পুলিসের পাহারা বসিয়াছে। কাট্টলির জনসাধারণ চট্টগ্রাম শহরের গণিকালয় হইতে ১৩টি জেলের মেয়েকে উদ্ধার করিয়া গ্রামে আনিয়া স্বাভাবিক জীবনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। প্রথম যখন এখানে আন্দোলন আরম্ভ হয়, তখন দুর্ব্বৃত্তেরা অনেক শাসাইয়াছিল, মেয়েরাও ভরসা করিয়া সহজে আসিতে চাহে নাই। কিন্তু দশ জন মিলিয়া উৎসাহের সঙ্গে আন্দোলন চালাইয়া গিয়াছে, তাহার ফলও ফলিয়াছে। এমনি ভাবেই সকলের সমবেত চেষ্টায়, অকুণ্ঠিত দানে এবং নির্ভীক আন্দোলনে

কাটলির ভাঙা সমাজ আবার গড়িয়া উঠিতে আরম্ভ করিয়াছে। কাটলি যাহা পারিয়াছে, প্রত্যেক গ্রামই তাহা পারে।

আর একটি জায়গার উদাহরণ দিই। ময়মনসিংহ জেলার নেত্রকোনা মহকুমার অন্তর্গত কাইলাটি ইউনিয়ন। এই ইউনিয়নের মধ্যে ৩৯টি গ্রাম আছে, সাবালক অধিবাসীর সংখ্যা ১০০০। বালি গ্রামের উৎসাহী কৃষক কর্ম্মীরা অগ্রণী হইয়া এই ৩৯টি গ্রামকে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়াছে। এই ইউনিয়নে ১৬টি ফুড কমিটি আছে। এই কমিটির ভিতর চোরাকারবারীর প্রভাব পড়িতে পারে নাই। গ্রামের প্রয়োজনীয় জিনিসের সরবরাহ যাহা কিছু আসে তাহা এই ফুড কমিটির নির্দ্দেশ অনুসারে ঠিকমত বিতরণ করা হয়। একবার নেত্রকোনার এস-ডি-ও নিয়ম করিয়া দিলেন, চিনি না লইলে নুন দেওয়া হইবে না। অত্যন্ত খারাপ ময়লা চিনি দেওয়া হইতেছিল, গ্রামবাসী সে-চিনি লইতে চাহে না। অথচ এস-ডি-ওর জিদ, চিনি না লইলে তিনি নুন দিবেন না। এই অঞ্চলে যদি সঙ্ঘবদ্ধ এবং একতা না থাকিত, তাহ হইলে অবস্থাপন্ন লোকে কায়দা করিয়া নুন জোগাড় করিতে পারিত, মারা পড়িত গরীব লোক। কিন্তু ঐ সমগ্র ইউনিয়নের লোক সভা করিয়া প্রতিবাদ জানাইল, তাহারা দাবি করিল চিনি ছাড়াই নুন দিতে হইবে এবং খারাপ চিনির জায়গায় ভালো চিনি সরবরাহ করিতে হইবে। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কেহ স্বতন্ত্রভাবে নুন আনিবার চেষ্টা করিল না। অনেক দেখা সাক্ষাৎ এবং অনেক দরবারেও যখন এস-ডি-ও সাহেবের মন টলিল না, তখন একদিন ৮০০ লোকের এক মিছিল নেত্রকোনায় উপস্থিত হইল। এই নেত্রকোনাতেই কিছুদিন আগে জনগণের আন্দোলনের ফলে একজন সাপ্লাই অফিসারকে দুর্নীতির জন্য গেরেফ্‌তার করা হইয়াছিল। এস-ডি-ও সাহেব কাইলাটি ইউনিয়নের একতাবদ্ধ অভিযানের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে সাহস করিলেন না, চিনি না নিলেও নুন দেওয়া হইবে ঘোষণা করিলেন। আর একবার কাপড়ের দারুণ অভাব। নেত্রকোনায় ১০০ জোড়া কাপড় আসিল, কিন্তু তাহার খরিদ্দার জুটিল ১০,০০০। কাইলাটি ইউনিয়নের লোক সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে ১৫০ রেশন কার্ড লইয়া নেত্রকোনায় উপস্থিত হইল। কিন্তু কাপড় পাওয়া গেল মাত্র ৮০ খানা। তখন

কার কার দরকার বেশি তাহার হিসাব লইয়া স্থানীয় ফুড-কমিটির মারফৎ ৮০ খানা কাপড় বিতরণ করিয়া দেওয়া হয়। ঐক্য ও সজ্ঘবদ্ধতা যদি এই অঞ্চলে না থাকিত তবে ভাগ্যবানেরাই এই কাপড় পাইত, যাঁহাদের দরকার বেশি তাহারা হয়তো পাইতই না।

কাইলাটি ইউনিয়নের অধিবাসীরা সজ্ঘবদ্ধভাবে পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করে, নিজেদের অভাব দূর করার জন্য একতাবদ্ধ হয় এবং আমলাদের সঙ্গে যখন লড়িতে হয় তখন সকলে দলবদ্ধভাবে লড়ে। সম্প্রতি তাহারা একটি সমবায়-সমিতি গঠন করিয়াছে। এই সমিতির উদ্দেশ্য স্থানীয় গ্রামবাসীদের প্রয়োজনীয় সমস্ত জিনিস কণ্ট্রোল-দরে আনিয়া সরবরাহ করা। দুই টাকা করিয়া শেয়ার বিক্রয় করিয়া তাহারা প্রায় ৩০০০ টাকা তুলিয়াছে।

সমবায়-সমিতি গড়িবার সঙ্গে সঙ্গেই সমস্যা মিটিয়া যাইবে না, কারণ সরকারি কর্ম্মচারীর মতলব যদি খারাপ হয় তাহা হইলে তিনি সমবায়-সমিতির মারফৎ জিনিস দিতে চাহিবেন না, ডিলারদের কাছে জিনিস দিবেন। এই রকম বহু জায়গায় হইয়া থাকে। এমনও হইতে পারে যে, এই অঞ্চলে যথেষ্ট জিনিস সরবরাহ করাই হইল না। কিন্তু কাইলাটি ইউনিয়নের সুবিধা এই যে, সমবায়-সমিতির বিরুদ্ধে এখানে কোনো ডিলার পাওয়া যাইবে না, সমবায়-সমিতিকে ডুবাইয়া নিজের পসার বাড়ানোর লোভ যদি কাহারও হয় তবে তাহাকে গ্রামে টিকিতে হইবে না। একটা ইউনিয়নের ১০০০০ লোক সজ্ঘবদ্ধ হইলে জিনিস আদায় করিতে পারিবে। যথেষ্ট পারিমাণ জিনিস যদি নাও পাওয়া যায়, তাহা হইলেও যাহা পাওয়া যাইবে, অভাবের তারতম্য অনুসারে ন্যায্য ভাবে তাহা বিতরণ করা সম্ভব হইবে। এই ভাবে গ্রামের ভিতর নিজেদের চেষ্টায় যতটুকু সাম্য ও গণতন্ত্র গড়িয়া তোলা যায়, তাহাই বা মন্দ কী।

ইহাকে ছোট কাজ কিংবা অরাজনৈতিক কাজ বলিয়া কোনো স্বদেশভক্ত নাসিকা কুঞ্চিত করিবেন না। গ্রাম্য জীবন যখন ভাঙিয়া চুরমার হইয়া যাইতেছে, দশজনে যখন একজনকে বাঁচাইবার কথা ভুলিতে বসিয়াছে, মৃত্যু-তাণ্ডবের ভিতর যখন দুস্থ নরনারীর প্রতিবেশী অতিরিক্ত লাভের লোভে উন্মত্ত, তখন গ্রাম্য জীবন পুনর্গঠনের পথই সাম্য ও গণতন্ত্রের পথ, জাতীয় জীবন সংগঠনের পথ।

খণ্ড খণ্ড ও বিচ্ছিন্ন ভাবে সঙ্কট রোধ করিবার চেষ্টা নানা স্থানে হইতেছে। দুস্থা নারীদের সাহায্য করিবার জন্য মহিলা কর্ম্মীরা অনেক জায়গায় শিল্পকেন্দ্র খুলিয়াছেন। নারী-সেবা সঙ্ঘ, মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি ও নিখিল-ভারত স্ত্রী সঙ্ঘ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের পরিচালনায় অনেক কেন্দ্র আছে। কলিকাতার এমনি একটা কেন্দ্রে প্রতিদিন ৩০০ গরীব মেয়ে সেলাইয়ের কাজ করে। কলিকাতায় এই কেন্দ্রটিই সবচেয়ে ভালো চলে। এখানে যে-স্ত্রীলোকেরা কাজ করে তাহারা প্রতিদিন ।।০ আনা হইতে ১৲ পর্য্যন্ত মজুরি পায়। তাহাদের তৈরি জিনিসগুলি বিভিন্ন দোকানে বিক্রয় করা হয়। একজন শিক্ষিতা মহিলা এই কেন্দ্র পরিচালনা করেন। যে-সব স্ত্রীলোক এখানে কাজ করে তাহাদের ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শিখাইবার জন্য এখানেই স্কুল চালানো হয়। যাঁহারা মেয়েদের সেলাইয়ের কাজ শিখান তাঁহাদের জন্যও বিশেষ শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। এখানে যে-মেয়েরা কাজ করে তাহাদের জন্য সম্প্রতি পড়া আলোচনা ও আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা করার চেষ্টা হইতেছে। এই কেন্দ্রের পরিচালনার দক্ষতা দেখাইয়া পরিচালিকা গভর্নমেণ্টের পুনর্গঠন তহবিল হইতে ২০০০০ টাকা আদায় করিতে পারিয়াছেন।

এই রকম প্রতিষ্ঠান দেশে শত শত হওয়া দরকার। দেশময় দুস্থাদের জন্য এমন শিল্পকেন্দ্র গড়িয়া তুলিতে পারিলে সমাজের ভাঙনের গতি রোধ করা যায়, অনেক স্ত্রীলোক রাস্তা ছাড়িয়া ঘরে আসিতে পারে, ভিক্ষা ছাড়িয়া গৃহস্থ হইতে পারে, আত্মবিক্রয় না করিয়া আবার সমাজে দশ জনের একজন হইতে পারে।

বাংলা গভর্নমেণ্ট গ্রাম পুনর্গঠনের জন্য যে-টাকা মঞ্জুর করিয়াছে তাহা যদি যথারীতি সক্রিয় রিলিফ কমিটি এবং দেশহিতৈষী সমাজসেবীদের মারফত ব্যয় করা হয়, তাহা হইলে ঐ অল্প টাকাও ভালোভাবে খরচ হয়। সরকারি কর্ম্মচারী, কণ্ট্রাক্টর বা ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট দিয়া এই কাজ করাইলে তাহার কী ফল হয় চট্টগ্রামে তাহার ভুরি ভুরি উদাহরণ আছে। সাচ্চা সমাজসেবক এবং দেশহিতৈষীরা ভার না লইলে দুর্ব্বৃত্তেরা গ্রাম পুনর্গঠনের টাকা এবং দুস্থাদের মানইজ্জত লইয়া ছিনিমিনি খেলিবে।

সঙ্ঘবদ্ধ দেশসেবার দ্বারা ধ্বংসের গতি কী পরিমাণ রোধ করা যায় তাহার উদাহরণ বঙ্গীয় মেডিক্যাল রিলিফ কো-অর্ডিনেশন কমিটি। এই কমিটি ১৯৪৪ সালে ৫৫টি

চিকিৎসক-বাহিনী পাঠাইয়া বাংলার বিভিন্ন স্থানে ৬ লক্ষ লোকের চিকিৎসা করিয়াছে। তাহা ছাড়া বিভিন্ন রিলিফ কমিটি উক্ত প্রতিষ্ঠানের পরিচালনাধীনে মোট ১৫০টি চিকিৎসক-বাহিনী পাঠাইয়া বাংলার নানা স্থানে মোট ১৯ লক্ষ লোকের চিকিৎসা করিয়াছে। মোট এই উনিশ লক্ষ রোগী দেশবাসীর ঐকান্তিক চেষ্টায় রোগের সঙ্গে লড়িয়া বাঁচিয়া উঠিয়াছে। দেশবাসী যদি আজ অকুণ্ঠিত চিত্তে অর্থ দান করিয়া মেডিক্যাল রিলিফ কো-অর্ডিনেশন কমিটির কাজ প্রসারিত করিতে সাহায্য করেন, রোগের হাত হইতে দেশ তাহা হইলে বাঁচে।

প্রত্যেক গ্রামের ভিতর চাই আত্মরক্ষার জন্য সমবেত প্রচেষ্টা। ভাঙনের হাত হইতে আমাদের সমাজকে আমরা বাঁচাইব, ইহাই হউক দেশবাসীর আমৃত্যু পণ। রোগীর জন্য হাসপাতাল, দুস্থের জন্য কর্মকেন্দ্র, শিশুর জন্য দুগ্ধকেন্দ্র, পণ্য বিতরণের জন্য ফুড-কমিটি ও সমবায়-সমিতি যদি প্রত্যেক গ্রামে গ্রামে খোলা হয়, বাঙালীর সমাজ তাহা হইলে বাঁচিয়া যাইবে। গ্রামের ভিতর মজুত, স্বার্থপরতা ও দুর্নীতি যদি কেহ বরদাশ্‌ত না করে, তাহা হইলে সে-গ্রাম আদর্শ গ্রামে পরিণত হইবে। কিন্তু আমাদের দেশের নেতারা যতদিন দলে দলে ঝগড়া করিতে থাকিবেন, ততদিন সঙ্ঘবদ্ধ সমাজসেবায় কাহারও উৎসাহ জাগিবে না। কংগ্রেসসেবী যদি দিনরাত ভাবিতে থাকেন কী করিয়া কমিউনিষ্টদের একঘরে করা যায়, কী করিয়া কৃষক-সমিতির বিরুদ্ধে আর-একটা কৃষক-সমিতি খাড়া করা যায়, এবং কী করিয়া লীগকে হেয় প্রতিপন্ন করা যায়; লীগভক্ত যদি দিনরাত ভাবেন যে কংগ্রেস ও কমিউনিষ্টদের বিরুদ্ধে তিক্ততা ছড়াইয়াই বড় হইতে হইবে; তাহা হইলে ততদিন সাধারণ মানুষ শুধু হা-হুতাশই করিবে। দেশের নেতাদের সমস্ত শক্তি যদি ব্যয় হয় আত্মকলহে এবং ভ্রাতৃনিগ্রহে, তাহা হইলে আমলাতন্ত্রের নিকট হইতে যে গ্রামসংগঠনের কোনো চেষ্টা আসিবে না সে-বিষয়ে সন্দেহ কী আছে? কংগ্রেস, কমিউনিষ্ট এবং লীগ এই তিনের ঐক্য আমাদের সমাজ এবং স্বজাতির প্রধান মূলধন। বাংলার এত বড় দুর্যোগে যদি এই তিনের দ্বন্দ্ব না মেটে, তাহা হইলে মৃত্যুই বিজয়ী হইবে। ধ্বংসভূমিতে কোনো দলই বাড়িবে না। বাংলার পুনর্গঠনের জন্য সকল দল মিলিয়া একটি লক্ষ্য ও কর্মপন্থা স্থির করুন এবং সেই কর্মপন্থা লইয়া কাজে নামুন, দেশের

সর্ব্বসাধারণের মনে উৎসাহ আসিবে, ভরসা জাগিবে। হতাশা ও আত্মকলহ ধ্বংসের শক্তিকে বড় করিয়াছে, ঐক্য ও ভরসাই জীবনস্রোত বহাইবে।

বাংলার সমাজ স্থায়ী ভাবে গড়িয়া তুলিবার জন্য চাই পূর্ণ স্বাধীনতা এবং জমিদারি প্রথার উচ্ছেদ। জনপ্রতিনিধিদের লইয়া এমন একটা গভর্নমেণ্ট এদেশে গঠন করিতে হইবে যে-গভর্নমেণ্ট কৃষি ও শিল্পের ক্রমবিকাশের দিকে তাহার সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিতে পারিবে। নদী-নালার সংস্কার চাই, পতিত জমিতে সেচের সুবন্দোবস্ত চাই, শিল্প বিস্তারের দ্বারা প্রয়োজনীয় বস্তুর প্রাচুর্য্য চাই, গ্রাম্য কারিগরদের সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া তাহাদের কাঁচা মাল এবং অন্যান্য মাল সরবরাহের ব্যবস্থা চাই। কৃষির জন্য চাই গরু, সার এবং বীজ। যে-চোরাবাজার আজ সমস্ত জিনিস পাওয়ার পথে বাধা তাহাকে সমূলে উৎপাটিত করিবার জন্য চাই সরকারি সরবরাহ অর্থাৎ কণ্ট্রোল এবং রেশনিং। যুদ্ধ থামিলেই আপনা হইতে আগের স্বাভাবিক জীবন ফিরিয়া আসিবে না, চোরাকারবারীরা ইতিমধ্যে সমাজের উপর যে একচেটিয়া দখল বসাইয়াছে, তাহা সহজে দমিবে না। যুদ্ধের পর প্ল্যান করিয়া কৃষি এবং শিল্পের বিস্তার করিতে হইবে, বিক্রয় এবং মুনাফার উপর দখল না থাকিলে প্ল্যান সম্ভব নয়। বড় বড় একচেটিয়া কারবারী যদি অবাধ বাণিজ্য চালাইতে পারে, তাহা হইলে কোনো প্ল্যান কার্য্যকরী হইবে না।

বাংলার ভাঙা সমাজ গড়িয়া তুলিতে অনেক দিন সময় লাগিবে,একচেটিয়া কারবারী-দের হাতে বাজারের দখল থাকিলে তাহারা এই সমাজ আর গড়িতে দিবে না।

যুদ্ধের ভিতর বাংলার সমাজ-জীবনে ভীষণ ভাঙন দেখা দিয়াছে। যুদ্ধপূর্ব্ব যুগের বাংলা আজ আর বাঁচিয়া নাই, সে-বাংলা আর ফিরিয়া আসিবে না। কিন্তু এবার এক নতুন বাংলা আসিতে পারে যদি আমরা মিলিত ভাবে বাংলার গ্রামে-গ্রামে নূতন সমাজ গড়িয়া তুলি।

এই লক্ষ্য সাধনের জন্য কোনো একটা দলের ক্ষমতা যথেষ্ট নয়। বাংলার এই দুর্য্যোগ এত বড় যে ইহার চেয়ে কোন দলগত স্বার্থই বড় নয়। কংগ্রেস, লীগ এবং কমিউনিষ্ট এই লক্ষ্য সাধনের জন্য যদি একতাবদ্ধ হয়, তাহা হইলে তাহাদের সমবেত শক্তির কাছে সমস্ত বাধা-বিপত্তিই পরাস্ত হইবে।

২০৪৮